

# নবীজিৱ সংসার



# নবাজির সংসার



শাইখ আলিহ আল-মুনাজ্জিদ

আয়াতুল্লাহ নেওয়াজ

অনূদিত

আজলাফ  
মাকতাবাতুল আজলাফ

## বিষয়সূচী

অনুবাদকের কথা .....	১৩
স্ত্রীদের সাথে যেমন ছিলেন নবীজি ﷺ .....	১৫
নবীজির ﷺ বৈবাহিক জীবন থেকে উদাহরণ .....	১৭
নবীজি ﷺ তাঁর স্ত্রীদের প্রতিদিন সময় দিতেন .....	১৮
প্রচুর ব্যস্ততা সত্ত্বেও স্ত্রীদের সাথে গল্প করতেন.....	১৮
ইবাদাতে সময় দেওয়ার পাশাপাশি স্ত্রীদেরকেও সময় দিতেন .....	১৯
ভ্রমণের সময় স্ত্রীর সাথে গল্প করতেন .....	২০
স্ত্রীদের অধিকার রক্ষায় তিনি ﷺ ছিলেন তৎপর.....	২০
খাদিজার ﷺ নাম বলার সময় তার প্রশংসা করতেন.....	২১
খাদিজার ﷺ কথা মনে পড়লে খুশি হয়ে উঠতেন .....	২১
খাদিজার ﷺ বান্ধবীদের উপহার পাঠাতেন .....	২২
স্ত্রীদের সাথে উদার আচরণ করতেন .....	২৩
স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে কুণ্ঠাবোধ করতেন না .....	২৪
বাসা থেকে বের হবার সময় স্ত্রীকে চুমো দিতেন .....	২৫
আয়িশা রাযি. পান করার পর তার পান করার স্থানে চোঁট লাগিয়ে পান করতেন .....	২৫
আয়িশার রাযি. উরুতে মাথা রেখে ঘুমাতেন.....	২৬
একই চাদরের নিচে স্ত্রীর সঙ্গে ঘুমাতেন.....	২৭



স্ত্রীর সাথে একই পাত্র থেকে গোসল করতেন.....	২৭
আদর করে স্ত্রীদের উপনামে ডাকতেন.....	২৮
স্ত্রীদের নিয়ে দাওয়াত কবুল করতেন .....	২৮
স্ত্রীরা দেখা শেষে চলে যাবার সময় নিজে এগিয়ে দিতেন .....	২৯
নবীজি ﷺ স্ত্রীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ জীবন কাটিয়েছেন .....	২৯
কখনোই স্ত্রীদের মারেননি বা সমালোচনা করেননি .....	৩০
নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে পুরুষদের নির্দেশ দিয়েছেন .....	৩১
স্ত্রীদের অনুভূতির ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন.....	৩৩
অসুস্থ অবস্থায় স্ত্রীদের সান্ত্বনা দিতেন .....	৩৪
স্ত্রী অসুস্থ হলে রুকইয়াহ করতেন .....	৩৫
স্ত্রীর অনুপযুক্ত আচরণও সহ্য করতেন .....	৩৬
স্ত্রী সারাদিন দূরে থাকলে তা সহ্য করতেন .....	৩৭
বাসার কাজে স্ত্রীদের সাহায্য করতেন .....	৩৭
বাহনে উঠতে স্ত্রীকে সাহায্য করতেন.....	৩৮
শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও সুবাসের ব্যাপারে খেয়াল রাখতেন .....	৩৮
ঘুম থেকে উঠেই দাঁত ও মুখ পরিষ্কার করতেন.....	৩৯
সব সময় সুগন্ধি ব্যবহার করতেন .....	৩৯
স্ত্রীর জন্য নিজেকে সুশোভিত করতেন ও অন্যদের নির্দেশ দিতেন .....	৪০
স্ত্রীর কাছে নবীজি ﷺ তাঁর চুল ধুয়ে ও আঁচড়িয়ে নিতেন.....	৪১
হারাম না হলে স্ত্রীদের অনুরোধ মানার চেষ্টা করতেন.....	৪১
জায়েজ কবিতা শোনার ব্যাপারে স্ত্রীদের নিষেধ করেননি .....	৪২
অল্পবয়সী মেয়েদের সাথে আয়িশাকে রাখি. খেলার অনুমতি দিয়েছিলেন ...	৪৩



স্ত্রীর সঙ্গে নবীজি ﷺ দৌড়-প্রতিযোগিতা করতেন .....	৪৪
সফরে রাতেরবেলা স্ত্রীর সাথে গল্প করতেন .....	৪৫
স্ত্রীদের একসাথে মজা করতে দেখে হাসতেন.....	৪৬
স্ত্রীর ধাঁধা শুনতেন .....	৪৭
উপসংহার.....	৪৭
যেভাবে অন্য নারীদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে তাঁর স্ত্রীদের গড়ে তুলেছেন .....	৪৯
স্ত্রীদের ইবাদাত সম্পর্কে শেখাতেন.....	৫০
মন্দের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করতে তাদের শেখাতেন.....	৫০
তাদের উপকারী দুআ শেখাতেন.....	৫১
রাসূল ﷺ তাদের সহজ কিন্তু সর্বোত্তম ইবাদাতগুলো শেখাতেন.....	৫২
ইবাদাতে নিজের ওপর অত্যাচার করতে নিষেধ করতেন.....	৫২
পরিমাণে অল্প হলেও ইবাদাত নিয়মিত জারি রাখতে উৎসাহ দিতেন.....	৫৩
বেশি বেশি দান করতে উৎসাহ দিতেন .....	৫৩
যারা দান করবে তারা জান্নাতে তাঁর সাথে সবার আগে মিলিত হবে .....	৫৫
সচ্চরিত্র শেখাতেন .....	৫৬
জ্ঞান ছাড়াই কোনো বিষয়ে কথা বলতে নিষেধ করতেন.....	৫৬
তাকওয়া অর্জন ও ভালো ব্যবহার করতে বলতেন.....	৫৭
সহনশীলতা, উদারতা ও ক্ষমা করতে শেখাতেন.....	৫৭
ভালো কথা বলতে উৎসাহ দিতেন এবং অসার কথাবার্তা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিতেন। .....	৫৮
স্ত্রীদের আকীদা সম্পর্কে শেখাতেন.....	৫৮
মানুষের আকীদাসংক্রান্ত ভুলগুলো সম্পর্কে সতর্ক করতেন .....	৫৯

তাঁর ঘরে কোনো পাপ না ঘটান ব্যাপারে সজাগ থাকতেন .....	৫৯
মন্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন.....	৫৯
ছোট ছোট পাপের ব্যাপারেও স্ত্রীদের সাবধান করতেন .....	৬০
অস্পষ্ট ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে স্ত্রীকে উৎসাহ দিতেন .....	৬০
স্ত্রীদের ব্যাপারে নবীজির ﷺ গাইরাহ কাজ করত.....	৬১
কখনো স্ত্রীর ব্যাপারে মন্দ ধারণা রাখতেন না, বরং ছাড় দিতেন .....	৬২
প্রজ্ঞার সাথে স্ত্রীদের ঈর্ষার ব্যাপারগুলো সামলাতেন .....	৬৩
যেভাবে নবীজি ﷺ বৈবাহিক সমস্যার সমাধান করতেন.....	৬৭
ইফকের ঘটনা .....	৬৭
নবীজির ﷺ স্ত্রীদের ভরণপোষণ বাড়ানোর দাবি করার ঘটনা .....	৭৫
নবীজির ﷺ সাথে স্ত্রীদের মজা করার ঘটনা.....	৭৮
স্ত্রীদের থেকে কিছু দিনের জন্য একাকী থাকার পদ্ধতির সুফল .....	৭৯
উপসংহার .....	৮৩
সন্তানদের সাথে যেমন ছিলেন নবীজি ﷺ .....	৮৫
আল্লাহ নবীজিকে ﷺ অনেক সন্তান দান করেছিলেন .....	৮৬
নবীজি ﷺ সন্তানদের সুন্দর অর্থবহ নাম রাখতেন .....	৮৭
জন্মের দিনেই সন্তানদের নাম ঠিক করতেন .....	৮৭
সন্তানদের সাথে আচরণের ব্যাপারে নবীজির ﷺ শিক্ষা .....	৮৭
তাঁর কন্যাদের সর্বোত্তম মানুষদের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন .....	৮৮
বিয়ে দেওয়ার সময় তাঁর মেয়েদের মতামত জিজ্ঞেস করতেন .....	৮৯
তাঁর কন্যাদের বিয়েতে মোহরানার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতেন না .....	৯০
বিয়ের পর মেয়ের নতুন বাসস্থানের জন্য উপহার পাঠাতেন.....	৯০



মেয়েদের জন্য বিয়ে-ভোজের আয়োজন করতেন .....	৯১
বিয়ের পরও তাঁর কন্যাদের যত্ন নিতেন .....	৯১
মেয়ে ও জামাতার মনোমালিন্যে হস্তক্ষেপ করতেন না .....	৯২
কন্যাদের কেউ তাঁর কাছে বেড়াতে এলে স্বাগত জানাতেন.....	৯৩
কন্যাদের এমনভাবে বড় করেছেন যেন তারা দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করে ...	৯৪
দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বোত্তম হওয়ার ব্যাপারে সন্তানদের শেখাতেন.....	৯৪
ফাতিমাকে রাযি. নিজের কাজের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হতে বলতেন.....	৯৬
ফাতিমাকে রাযি. তাহাজ্জুদ আদায়ের নির্দেশ দিতেন.....	৯৬
কন্যাদের তিনি ❁ খুশি করার চেষ্টা করতেন .....	৯৭
নবীজি ❁ কন্যাদের উপহার দিতেন.....	৯৮
কন্যাদের সান্ত্বনা দিতেন এবং ধৈর্যধারণের শিক্ষা দিতেন.....	৯৮
সন্তানের মৃত্যুতে শোকাহত হতেন .....	১০০
নাতিদের সাথে যেমন ছিলেন নবী ❁ .....	১০২
বাচ্চাদের তাহনীক করতেন.....	১০৩
কোলে নাতি প্রসাব করলে রেগে যেতেন না .....	১০৪
নাতিদের মসজিদে নিয়ে যেতেন.....	১০৫
সালাতের মধ্যে শিশুদের খেলাধুলা সহ্য করতেন .....	১০৬
হাসান ও হুসাইন তাঁর পিঠে চড়লে রাগ করতেন না.....	১০৬
নবীজি ❁ তাদের অনেক ভালোবাসতেন .....	১০৭
নাতিদের কোলে নিয়ে চুমো দিতেন .....	১০৭
নবীজি ❁ তাদের নিজের কাঁধে চড়াতেন .....	১০৮
নাতিদের বাহনে উঠিয়ে নিতেন .....	১০৮



শিশুদের সাথে খেলাধুলা করতেন .....	১০৯
নাতিদের জন্য দুআ করতেন.....	১০৯
হাদিয়া পেলে তার একটি অংশ তাদের দিতেন .....	১১০
হারাম থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দিতেন .....	১১০
সন্তান ভীকৃত্য ও কৃপণতার কারণ .....	১১১
উপসংহার .....	১১১
আত্মীয়দের সাথে যেমন ছিলেন নবীজি ﷺ .....	১১২
নবীজির ﷺ চাচা এবং ফুফুগণ .....	১১৩
নবীজি ﷺ আত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে বলতেন .....	১১৪
নবীজি ﷺ তাঁর মায়ের কবর দেখতে গিয়ে কাঁদতেন .....	১১৫
নিকটাত্মীয়দের ইসলামের দিকে ডাকতেন .....	১১৬
চাচা আবু তালিবকে পথপ্রদর্শনে আগ্রহী ছিলেন .....	১১৭
চাচা আব্বাসের সাথে পরামর্শ করতেন .....	১১৮
আত্মীয়দের আমল সংশোধন করতেন .....	১১৯
কেউ পাপ করতে গেলে তাকে থামাতেন .....	১১৯
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আত্মীয়দের সাহায্য চাইতেন .....	১২০
আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন .....	১২০
আত্মীয়দের প্রতি উদার আচরণ করতেন .....	১২২
নবীজি ﷺ আত্মীয়দের হজ্বের ব্যাপারে অনেক আগ্রহী ছিলেন .....	১২৪
আত্মীয়দের স্বাস্থ্য ও সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন .....	১২৪
আত্মীয়দের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিতেন .....	১২৫
জাফরের হাবশা থেকে ফিরে আসায় নবীজি ﷺ অনেক খুশি হয়েছিলেন ...	১২৫

ছোট শিশুদের মাথায় হাত রেখে দুআ করতেন .....	১২৬
আত্মীয়দের যত্ন করার ঘটনা .....	১২৭
আত্মীয়দের জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করতেন .....	১২৭
অসুস্থ হলে আব্বাসকে দেখতে যেতেন .....	১২৮
আত্মীয় হলেও ইসলামের ব্যাপারে কোনো পক্ষপাতিত্ব করতেন না .....	১২৮
অতিথির সাথে যেমন ছিলেন নবীজি ﷺ .....	১৩০
মেজবান হিসেবে নবীজি ﷺ .....	১৩০
অতিথিকে সম্মান করা ঈমানের অঙ্গ .....	১৩২
মেজবানের আতিথেয়তার সীমা নবীজি ﷺ নির্ধারণ করে দিয়েছেন .....	১৩৩
নিজের ক্ষুধা ও কষ্টের সময়ও উদারতা দেখাতেন .....	১৩৪
মেহমানদের সাথে বসে একসাথে হেসে গল্প করতেন .....	১৩৬
কাফের হলেও মেহমানকে নবীজি ﷺ সম্মান করতেন .....	১৩৮
নবীজি ﷺ অতিথিদের নিজ হাতে খাবার পরিবেশন করতেন .....	১৩৮
মেহমান হিসেবে যেমন ছিলেন নবীজি ﷺ .....	১৪০
মাঝে মাঝে নিজেই কিছু সাহাবীর বাসায় মেহমান হিসেবে যেতেন .....	১৪১
উপসংহার .....	১৪৩
সাহাবীদের সাথে যেমন ছিলেন নবীজি ﷺ .....	১৪৪
নবীজি ﷺ প্রকাশ্যে তাদের প্রতি ভালোবাসা জানিয়েছেন .....	১৪৫
সাহাবীদের সম্পর্কে কটুকথা নবীজি ﷺ সহ্য করতেন না .....	১৪৫
ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের সম্মান করতেন .....	১৪৬
অন্য সাহাবীদের তুলনায় ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের বেশি প্রাধান্য দিতেন .....	১৪৮
অন্যদের চেয়ে সাহাবীদের প্রতি বেশি সহনশীল ছিলেন .....	১৪৯

ব্যক্তিগত বিষয়েও সাহাবীদের ওপর আস্থা রাখতেন.....	১৫০
কোনো সাহাবী অনুপস্থিত থাকলে তার খোঁজ নিতেন .....	১৫২
সাহাবীদের বিপদে খোঁজ নিতেন .....	১৫৩
সাহাবীদের মৃত্যুতে অনেক কষ্ট পেতেন এবং কাঁদতেন .....	১৫৩
সাহাবীদের মতামত ও পরামর্শ শুনতেন .....	১৫৫
বদর যুদ্ধে নবীজি সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন.....	১৫৬
সাহাবাদের জীবনযাপন নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতেন.....	১৫৮
কোনো কারণে সম্পদের অংশ দিতে না পারলেও সাহাবীদের খুশি রাখতেন ....	১৫৯
প্রত্যেক সাহাবীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আচরণ করতেন .....	১৬১
উসমানের রাযি. লজ্জার ব্যাপারে খেয়াল রাখতেন.....	১৬১
সাহাবীদের ভালো পরিণতি ও জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন .....	১৬২
উপসংহার .....	১৬২



## অনুবাদকের কথা

শুরু করছি সেই মহান রবের নাম নিয়ে যিনি ছাড়া আর কোনো তাওফীকদাতা নেই। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক- আমাদের বইয়ের মূল চরিত্র, যাকে ঘিরে এ আয়োজন- নবীজি মুহাম্মাদ ﷺ এর ওপর।

নবীজি ﷺ! আমাদের ভালোবাসার মানুষ যাকে আমরা দেখি নি কখনোই, কিন্তু তাঁকে আমরা ভালোবাসি সবার চেয়ে বেশি। আমরা চেষ্টা করি, জীবনের পরতে পরতে তাঁকে অনুসরণ করতে, তাঁর মতো হতে। হৃদয়ে আশা হয়ত আমরা সেই মানুষগুলোর একজন হতে পারব যাদের ব্যাপারে তিনি ﷺ বলেছেন,

“...আমার বড় ইচ্ছা হয় আমাদের ভাইদেরকে দেখি। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন, তোমরা তো আমার সাহাবা। আর যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসেনি তারা আমাদের ভাই।...”<sup>১</sup>

যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের পরিবার ও সমাজে সমস্যার জটিলতা বেড়ে চলেছে। পরিবারগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে। স্ত্রী-সন্তানের সাথে দূরত্ব বাড়ছে। নবীজির ﷺ জীবনের দিকে তাকাই। দাওয়াহ-জিহাদের শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি পরম মমতায় পরিবারকে আগলে রাখতেন। কীভাবে পারতেন তিনি? তাঁর প্রতিটি আচরণ তাই আমাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানা প্রয়োজন যেন আমরা নিজেদের জীবনে স্ত্রী-সন্তান-বন্ধুদের সাথে আচরণে তাঁর মতো হতে পারি।

শাইখ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ (হাফি) আমাদের জন্য এ কাজটি তার লেখনীর মাধ্যমে আঞ্জাম দিয়েছেন। শাইখের একেকটি বই যেন ইলমের একেকটি ঝর্ণাধারা। তাত্ত্বিক আলোচনার চেয়ে প্রায়োগিক আলোচনাই বেশি তার বইগুলোতে। শাইখকে আল্লাহ উত্তম পুরস্কার দান করুন, জালিমের হাত থেকে রক্ষা করুন, সুস্থ রাখুন।

কিছু কৃতজ্ঞতা না জানালেই নয়। শত ব্যস্ততার মাঝে আবদুর রহমান মুয়ায ভাই অনুবাদ পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেছেন, আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমার আহলিয়ার

[১] মুসলিম: ৪৭২

প্রাপ্য সময়গুলো অনুবাদে কাজে লাগিয়েছি। হাসিমুখে সে মেনে নিয়ে পাশে থেকেছে।  
আল্লাহ তাকেও উত্তম প্রতিদান দিন।

পাঠকদের থেকে আরজ রইল এই বইয়ের সাথে জড়িত সকলের জন্য একটিবার হলেও  
হাত তুলে মাগফিরাতের দু'আ করার।  
ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

আয়াতুল্লাহ নেওয়াজ  
ayatnawaz9@gmail.com  
২৯ জিলহজ্জ, ১৪৪০ হিজরি



## প্রথম অধ্যায়

### স্ত্রীদের সাথে যেমন ছিলেন নবীজি ﷺ

স্ত্রীদের সাথে নবীজির ﷺ সম্পর্ক ছিল মধুর ও শ্রদ্ধাপূর্ণ। তাদের সাথে তাঁর আচরণ সর্বকালের সবার জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। নবীজির ﷺ জীবনী পড়ে আমরা জানতে পারি, তিনি তাঁর স্ত্রীদের প্রতি খুবই দয়ালু ও সহনশীল ছিলেন। তারা তাঁকে ছাড়া তাদের জীবন কল্পনা করতে পারতেন না। এমনকি নবীজি ﷺ একবার তাদের এ সুযোগও দিয়েছিলেন যে, তারা চাইলে তাঁর সাথে বিয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারবে। এর কারণ ছিল উদারতা ও দানশীলতার কারণে নবীজি ﷺ দারিদ্রের মাঝেই সব সময় জীবনযাপন করতেন। কিন্তু তারা তাঁকে ছেড়ে যাননি।

আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তাদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি পুরুষদের নারীদের সাথে কল্যাণকামী আচরণ করতে উৎসাহ দিতেন। তিনি বলতেন, মুমিনদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট তারাই, যারা চরিত্রে উত্তম এবং যারা তাদের পরিবারের প্রতি করুণাময়। নবীজির ﷺ পদাঙ্ক অনুসরণে আমাদের তেমন কোনো কষ্টই করা লাগে না, অথচ আমরা এর মাধ্যমে একইসাথে আল্লাহর পুরস্কার ও স্ত্রীদের প্রেম ও ভালোবাসা লাভ করতে পারি।

নবীজি ﷺ সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গতভাবে মানবিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে তোলার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিখিয়েছেন পারস্পরিক প্রেম, স্নেহ ও দয়ার দৃঢ় বন্ধনে সম্পর্কগুলো কীভাবে জুড়ে রাখতে হয়। তিনি যেমন শিখিয়েছেন স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই বিয়ের বৈধ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কীভাবে তাদের প্রকৃতিগত সহজাত কামনা ও ভালোবাসা লাভ করতে পারবে, তেমনি একই সাথে বিয়ের বাহিরে কামনা চরিতার্থ করার নিষিদ্ধ সব পথ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। দম্পতির কোনো এক পক্ষের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের সুযোগ না রেখে বরং উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষার পথ বাতলে



দিয়েছেন। এভাবে উভয় পক্ষকেই অপর পক্ষের শোষণ ও নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করেছেন। বিয়ের পর সুখী ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করার সব উপকরণই তিনি আমাদের শিখিয়েছেন।

অনেক সময় এমনও হয়, অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোনো দম্পতির একসাথে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে জীবনযাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে কোনো পক্ষেরই স্বার্থ ও অনুভূতিকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে শান্তিপূর্ণভাবে বিয়ের দুর্গ ছেড়ে বের হয়ে আসার পথ রয়েছে। এ-ক্ষেত্রেও ইসলাম উভয়পক্ষের প্রতি সমানভাবে ন্যায়বিচার করেছে। দু'পক্ষকেই পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে কিংবা ইসলামী শরীয়া আইনের হস্তক্ষেপের সাহায্যে সম্পর্ক থেকে বের হয়ে আসার সমান সুযোগ দিয়েছে, যেন কোনো পক্ষের স্বার্থই অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা আমাদের আদর্শ হিসেবে নবীজির ﷺ পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, “তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলের অনুসরণের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। (আল কুরআন, ৩৩ : ২১)

সব মুসলিমকেই তাই (তার অবস্থান অনুযায়ী) নবীজিকে ﷺ অনুসরণ করতে হবে। এজন্য তাঁর সম্পর্কে জানতে হবে। একজন প্রকৃত স্বামী, প্রকৃত শাসক বা একজন প্রকৃত নেতা হতে হলে নবীজি ﷺ সম্পর্কে জানতে হবে। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি অনুকরণীয় সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ।

স্ত্রীদের সাথে নবীজির ﷺ আচরণ প্রতিটি স্বামীর জন্য অনুপম আদর্শ। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে প্রতিটি স্বামী তার ঘর শান্তির নূরে আলোকিত করতে পারবেন। এভাবে প্রতিটি ঘর যদি আলোকিত হয়, তা হলে পুরো সমাজ আলোকিত হবে।

বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ে মূলত নবীজির ﷺ বৈবাহিক জীবন এবং তিনি তাঁর স্ত্রীদের সাথে কীভাবে আচরণ করতেন, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

## প্রথম অনুচ্ছেদ

### নবীজির ﷺ বৈবাহিক জীবন থেকে উদাহরণ

নবীজির ﷺ এগারোজন স্ত্রী ছিলেন—খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ, আয়িশা বিনতে আবু বাকর, হাফসা বিনতে উমার, সাওদা বিনতে যামআ আল-আমিরিয়াহ, যায়নাব বিনতে জাহশ আল-আসাদিয়া, যায়নাব বিনতে খুযায়মা আল-হিলালিয়া, উম্মে সালামা হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া আল-মাখযুমিয়া, উম্মে হাবীবা রামলা বিনতে আবু সুফিয়ান আল-আমাউইয়া, মায়মুনা বিনতে আল-হারিস আল-হিলালিয়া, জুওয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিস আল-মুস্তালিকিয়া এবং সাফিয়া বিনতে হুওয়াই আন-নাযিরিয়া রাযি।।

তাঁর মৃত্যুকালে নয়জন স্ত্রীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ তাঁর আগেই মারা যান। নবীজি ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সাথে সুখী জীবন কাটিয়েছেন, যা আল্লাহর বাণীতে উঠে এসেছে—“তাদের সাথে দয়াদ্র জীবন যাপন করো।” (আল কুরআন, ৪:১৯) ‘দয়া’ এখানে একটি ব্যাপকার্থক শব্দ, এর মাঝে সব কথা ও মহান আচরণ অন্তর্ভুক্ত। নবীজি ﷺ স্ত্রীদের সাথে ব্যবহারে সবার মাঝে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আর কেনই বা তা হবে না! তিনি নিজেই বলেছেন—“তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম সে-ই, যে তার স্ত্রীর সাথে ব্যবহারে সর্বোত্তম। নিশ্চয়ই আমি আমার স্ত্রীদের সাথে আচরণে সর্বোত্তম।” ১

নবীজি ﷺ স্ত্রীদের সাথে আচরণে মহান-হৃদয় ছিলেন—তাঁর জীবনীতে এর প্রচুর প্রমাণ দেখা যায়। আজ মানুষ যদি তাঁর পথ অনুসরণ করে তাঁর মতো স্ত্রীদের সাথে আচরণ করত, তা হলে অনেক বৈবাহিক সমস্যারই সমাধান হয়ে যেত। বর্তমানে

[১] তিরমিযী (৩৮৯৫)



বৈবাহিক সমস্যার কারণে বিবাহবিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সমাধানের লক্ষ্যে আমরা আল্লাহর নবীজির ﷺ বৈবাহিক জীবনের দিকে তাকাব এবং দেখব কীভাবে তিনি স্ত্রীদের সাথে মধুর আনন্দদায়ক জীবন কাটিয়েছেন। কীভাবে তিনি ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে আচরণ করতেন? কীভাবে নবীজি ﷺ তাদের ভুল উপেক্ষা করতেন? আমরাও তাঁর পথ অনুসরণ করে সেভাবেই আচরণ করব—কেননা তিনি ﷺ অনুসরণীয় শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

## নবীজি ﷺ তাঁর স্ত্রীদের প্রতিদিন সময় দিতেন

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, “আল্লাহর রাসূল ﷺ ফজরের সালাত শেষে তাঁর জায়গায় বসে থাকতেন এবং সূর্য ওঠা পর্যন্ত লোকেরা তাকে ঘিরে থাকত। (সূর্য উঠলে) তিনি ﷺ তাঁর স্ত্রীদের কাছে একে একে গিয়ে সালাম দিয়ে দুআ করতেন। এরপর তিনি ﷺ, সে-দিন যে স্ত্রীর ঘরে থাকার পালা থাকত, তার ঘরে গিয়ে থাকতেন।” ২

খেয়াল করে দেখুন, তিনি ﷺ প্রতিদিন সকালে এমনটা করতেন এবং সকালে এটিই থাকত তাঁর প্রথম কাজ। তাঁর স্ত্রীগণ তাঁকে ﷺ সব সময় কাছেই পেতেন, প্রতিদিনই তাঁর দেখা পেতেন তারা। এর সাথে তুলনা করুন তাদের, যারা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, অনেকে তো মাসের পর মাস স্ত্রীদের সাথে দেখা করে না। কিছু মানুষ প্রতিদিন তার বন্ধুদের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাত পর্যন্ত সময় কাটায়; এরপর যখন সে ঘরে ফেরে, তখন তার পরিবারের সবাই হয়তো ঘুমিয়ে গিয়েছে; সেও ক্লান্ত অবস্থায় বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে। কল্পনা করুন, তো কেমন হবে তার স্ত্রীর সাথে তার সম্পর্ক?

## প্রচুর ব্যস্ততা সত্ত্বেও স্ত্রীদের সাথে গল্প করতেন

এক রাতে আয়িশা রাযি. নবীজিকে ﷺ উন্মে জারের গল্প বলছিলেন। একবার এগারোজন নারী একসাথে জড়ো হয়ে কোনো গোপনীয়তা ছাড়াই নিজ নিজ স্বামীর ব্যাপারে বলবে বলে শপথ নিল। তারপর প্রত্যেকেই তার স্বামী সম্পর্কে বলল। উন্মে

[২] আল-মুজাম আল-আওসাতে (৫২১৬) তাবারানী।



জার তার স্বামীর অনুগ্রহ ও ভালোবাসার বর্ণনা দেওয়ার পর দেখা গেল, তাদের মধ্যে তার স্বামীই সর্বোত্তম ছিল। আয়িশা রাযি. বলেন, “আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, ‘আমি তোমার কাছে তেমন, যেমনটা ছিল আবু জার উম্মে জারের কাছে।’” ৩

একজন স্বামীকে অবশ্যই তার স্ত্রীর জন্য সময় বের করে তার কাছে বসে তার কথা শোনা উচিত, গল্প করা উচিত। অনেক স্ত্রী অভিযোগ করে তাদের স্বামী সারাদিন কর্মক্ষেত্রে থাকে এবং তারা বাড়ি ফিরে এসে হয় টিভি দেখতে বসে যায়, নাহয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইন্টারনেটে ব্যস্ত থাকে। আর তার স্ত্রী চেয়ে থাকে—কখন সে একটু তার দিকে মনোযোগ দেবে। কিন্তু দেখা যায়, স্বামী কাজ শেষ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় কথা বলার কোনো আগ্রহই তার মধ্যে থাকে না। একসময় মরা মানুষের মতো ঘুমিয়ে পড়ে। অনেকে তো টিভি দেখতে দেখতে রিমোট কন্ট্রোল হাতেই ঘুমিয়ে যায়। এসব আচরণের কারণে বেচারী স্ত্রী নিজেকে অবহেলিত মনে করতে থাকে।

অনেক ব্যবসায়ী বাড়িতে ফিরে এসেও ব্যবসার কাগজে ডুবে থাকে, যেন অফিসের প্রথম শিফট শেষ করে এসে বাসায় দ্বিতীয় শিফট শুরু করেছে। আর ওদিকে তার স্ত্রী তার সামান্য মনোযোগ পাবার আশায় ব্যাকুল হয়ে বসে থাকে। বর্তমানে স্বামীদের জন্য যোগাযোগের আধুনিক মাধ্যমগুলো স্ত্রীর সাথে সব সময় যোগাযোগ রাখার পথ সুগম করে দিয়েছে। চাইলেই সে এসএমএস বার্তা পাঠাতে পারে বা কল দিয়ে কথা বলে খোঁজখবর নিতে পারে। এতে এক মিনিটেরও বেশি সময় লাগে না, কিন্তু এটাই স্ত্রীর কাছে অনেক কিছু।

## ইবাদতে জগয় দেওয়ার পাশাপাশি স্ত্রীদেরকেও জগয় দিওন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “নবীজি ﷺ (ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত) সালাত পড়তেন। এরপর আমি জেগে থাকলে আমার সাথে কথা বলতেন। নাহলে জামাআতের সময় হওয়া পর্যন্ত শুয়ে থাকতেন।” ৪

[৩] বুখারী (৫১৮৯) ও মুসলিম (২৪৪৮)।

[৪] বুখারী (১১৬১)।

## ভ্রমণের সময় স্ত্রীর সাথে গল্প করতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “নবীজি ﷺ কোনো যাত্রায় বের হওয়ার আগে স্ত্রীর মাঝে লটারি করতেন। একবার লটারিতে আমার ও হাফসার নাম এল। আমরা দুজনে তাঁর সাথে বের হলাম। নবীজি ﷺ (উটের পিঠে) সারা দিন ভ্রমণে থাকতেন আর রাত হলে আমার সাথে হাটতেন আর গল্প করতেন।” ৫

## স্ত্রীদের অধিকার রক্ষায় তিনি ﷺ ছিলেন তৎপর

আল্লাহর রাসূল ﷺ খাদিজার রাযি. জীবদ্দশায় ও তার মৃত্যুর পর অনেক প্রশংসা করতেন; এমনকি সব স্ত্রীর মধ্যে তারই সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করতেন। তিনি ﷺ অনেক আশ্রয় নিয়ে তার গুণগুলোর কথা বলতেন, হৃদয়ে তার স্থানের কথা জানাতেন। মৃত্যুর পরও তাঁর হৃদয়ের সিংহাসন জুড়ে ছিলেন খাদিজা রাযি.।

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রীদের ব্যাপারে আমার মনে কখনো ঈর্ষা জাগেনি, কেবল খাদিজা রাযি. ছাড়া—যেখানে কিনা তাকে আমি কখনো দেখিইনি! যখনই আল্লাহর রাসূল ﷺ কোনো ভেড়া জবাই করতেন, তিনি ﷺ বলতেন, “এটি খাদিজার বান্ধবীদের কাছে পাঠাও।” একদিন আমি তাঁকে বললাম, “আপনার মনে খাদিজার গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি।” এ-কথা শুনে নবীজি ﷺ প্রশংসা করে বললেন, ‘সে তো এমন এমন ধরনের ছিল এবং সে তো আমার সন্তানদের মা।’ ৬

ইবনে হাজার রাহ. বলেন, “আল্লাহর রাসূল ﷺ কখনো তার প্রশংসা করতে ভুলতেন না, এমনকি তার মৃত্যুর পরেও প্রশংসা বন্ধ করেননি; বরং নবীজি ﷺ তার মৃত্যুর পরও তার কথা মনে করতেন, তার প্রশংসা ও ভালো গুণগুলো বর্ণনা করতেন। তিনি কত বিদূষী ও প্রজ্ঞাবতী ছিলেন, সে কথা বলতেন। মারিয়ামের পুত্র ইবরাহীম ছাড়া আল্লাহর রাসূলের ﷺ সব সন্তানের মা ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন তার দুই ছেলে ও চার মেয়ের মা; তারা হলেন :—কাশিম, আব্দুল্লাহ, যায়নাব, রুকাইয়্যা, উম্মে কুলসুম

[৫] বুখারী (৫২১১) ও মুসলিম (২৪৪৫)।

[৬] বুখারী (৩৮১৮) ও মুসলিম (২৪৩৫)।



এবং ফাতিমা।” ৭

## খাদিজার ﷺ নাম বলার সময় তার প্রশংসা করতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “যখনই আল্লাহর রাসূল ﷺ খাদিজার রাযি. নাম উল্লেখ করতেন, তার প্রশংসা করতেন। তার প্রশংসা করা এবং আল্লাহর কাছে দুআ করার ব্যাপারে কখনোই তিনি যেন ক্লান্ত হতেন না।” ৮

বর্তমান যুগে মানুষের বৈবাহিক অবস্থাগুলো আসলেই অবাক করার মতো। আজকাল যখন কোনো ব্যক্তি তার প্রথম স্ত্রী মৃত্যুর পর নতুন স্ত্রীকে বিয়ে করে—বিয়ের আসরেই দেখা যায়, সে দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রশংসা করছে আর প্রথম স্ত্রীর ভুলগুলো আলোচনা করছে। আরেকদিকে দেখা যায়, তালাকের পর স্ত্রীর দোষগুলো স্বামী বলে বেড়াচ্ছে আর এর সাথে সেগুলোর ব্যাপারে সে কতটা ধৈর্যশীল ছিল, বর্ণনা করতে থাকে। কিছু কিছু মানুষ তো এমন থাকে, যত ভালোই হোক না কেন, স্ত্রীর কোনো ভালো গুণের কথা কারও কাছেই বলে না।

## খাদিজার ﷺ কথা মনে পড়লে খুশি হয়ে উঠতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “একবার খাদিজার বোন হালা বিনতে খুওয়াইলিদ আল্লাহর রাসূলের ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। তার গলার স্বর খাদিজার কণ্ঠের অনুরূপ ছিল। এতে রাসূলের ﷺ খাদিজার রাযি. কথা মনে পড়ল। তিনি খুশিতে বলে উঠলেন, ‘হে আল্লাহ, এটা যেন হালা (খাদিজার বোন) হয়!’ আমি ঈর্ষা অনুভব করলাম; বললাম, ‘আপনি কুরাইশের সেই বৃদ্ধা মহিলার কথা এখনো বলেন, যার কিনা দাঁত পড়ে গিয়েছিল (বৃদ্ধ বয়সে কারণে); অনেক আগেই যে কিনা মারা গিয়েছে আর আল্লাহ আপনার জন্য উত্তম আরেকজন দিয়ে তাকে প্রতিস্থাপন করেছেন।’ তাঁর মুখের অভিব্যক্তি অন্ধকারচ্ছন্ন হয়ে উঠল, যা আমি তাঁর মধ্যে কেবলমাত্র আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে দেখতে পেতাম (পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মতো আযাবের ভয়ে) কিংবা

[৭] ফাতহুল বারী (১৩৭/৭)।

[৮] তাবারানী (৩১৯/১)।



তাঁর ওপর যখন ওহী আসত। তিনি ﷺ বললেন, ‘আল্লাহ আমাকে তার চেয়ে উত্তম কাউকে দিয়ে প্রতিস্থাপন করেননি। সে আমার ওপর বিশ্বাস করেছিল, যখন লোকেরা আমাকে অবিশ্বাস করত। সে আমাকে তার সম্পদ দিয়ে শক্তি যুগিয়েছিল, যখন লোকেরা আমাকে পরিত্যাগ করেছিল। তার মাধ্যমেই আল্লাহ আমাকে সন্তান দিয়েছেন।’ এ-কথা শুনে আয়িশা রাযি. তাঁকে বললেন, ‘যিনি আপনাকে সত্য বাণীসহ পাঠিয়েছেন, আমি তাঁর কসম করে বলছি, আজকের পর আমি তার প্রশংসা ছাড়া আর কোনো কথা বলব না।” ৯

ইবনে হাজর বলেন, “এ-হাদীস প্রমাণ করে যে, যখন কেউ কাউকে ভালোবাসে, তখন সে সে-সব বিষয়কেও ভালোবাসে, যা মানুষক (প্রেমাস্পদ) ভালোবাসে। মানুষকের সাথে সম্পর্কিত, এমনকি তার সাথে চেহারায় মিল আছে, এমন ব্যক্তিদেরকেও সে ভালোবাসে।” ১০

## খাদিজার ﷺ বান্ধবীদের উপহার পাঠাতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদিজার কথা ঘন ঘন উল্লেখ করতেন। যখনই নবীজি ﷺ কোনো ভেড়া কুরবানি করতেন, মাংস কেটে টুকরো করার পর কিছু অংশ তার বান্ধবীদের কাছেও পাঠাতেন।” ১১

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “যখনই নবীজি ﷺ কোনো ভেড়া কুরবানি করতেন, তিনি তার বান্ধবীদের খোঁজ নিতেন এবং তাদের জন্য উপহারস্বরূপ মাংস পাঠাতেন।” ১২

আল-মুবারাকপুরী রাহ. বলেন, “খাদিজার বান্ধবীদের উপহার দেওয়া তার প্রতি নবীজির ﷺ ভালোবাসার প্রতিফলন; তার দয়ার কথা স্মরণ করে এমনটা করতেন তিনি।” ১৩

নববী রাহ. বলেন, “এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নবীজি ﷺ স্ত্রীদের প্রতি

[৯] আহমাদ (২৪৩৪৩) এবং আত-তাবারানী (১৪/২৩)

[১০] ফাতহুল বারী (১৪০/৭)

[১১] বুখারী (৩৫৩৪) ও মুসলিম (২৪৩৫)

[১২] তিরমিযী (১৯৪০)

[১৩] তুহফাতুল আওয়ামী (১৩৪/৬)

বিশ্বস্ত ছিলেন এবং তাদের জীবদশায় ও তাদের মৃত্যুর পরেও উদারতার সাথে আচরণ করতেন। তাদের বান্ধবী ও আত্মীয়দের প্রতিও তিনি ছিলেন উদার।” ১৪

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, “যখনই আল্লাহর রাসূল ﷺ কোনো উপহার পেতেন, তিনি বলতেন, ‘এটি অমুকের কাছে নিয়ে যাও, কেননা সে খাদিজার বান্ধবী। এর কিছু তমুকের বাসায় নিয়ে যাও, কারণ সে খাদিজাকে ভালোবাসে।’” ১৫

## স্ত্রীদের সাথে উদার আচরণ করতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “নবীজি ﷺ আমার ঘরে ছিলেন এমন একদিন এক বয়স্ক ভদ্রমহিলা তাঁর কাছে এল। তিনি ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনি কে?’ জবাব দিল, ‘আমি জাশশামা আল-মুযানিয়্যা।’ তিনি ﷺ বললেন, ‘বরং আপনি তো হুসসানা। কেমন আছেন? আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা কেমন আছে? আপনি কী করছেন এখন? আপনাকে শেষবার দেখার পর আপনার দিনকাল কেমন কেটেছে?’ সে চলে গেলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তার সাথে এত বন্ধুত্বপূর্ণ ও দয়ালু ব্যবহার করলেন কেন?’ নবীজি ﷺ জবাব দিলেন, “আয়িশা, খাদিজা বেঁচে থাকতে সে আমাদের বাসায় আসত। আর পুরনো বন্ধুদের প্রতি দয়ার্দ্ৰ আচরণ করা তো ভালো ঈমানের লক্ষণ।” ১৬

লক্ষণীয় যে, এই মহিলা বৃদ্ধা ছিলেন, কিন্তু তারপরও নবীজি ﷺ তার নাম পরিবর্তন করে একটি সুন্দর নাম দলেন। জাশশামা অর্থ অলস ব্যক্তি—যে পরিশ্রম করতে চায় না, আর হুসসানাহ অর্থ মঙ্গল ও সৌন্দর্য। এভাবে মানুষের মন্দ নামগুলোকে বদলে নবীজি ﷺ সুন্দর নাম দিতেন।

মানুষের প্রতি বিশ্বস্ত ও দয়ালু আচরণ করা ভালো ঈমানের লক্ষণ। নবীজি ﷺ এ-বৃদ্ধাকে স্বাগত জানালেন, দয়ার সাথে খাতির করলেন। এটি ছিল তার বিগত স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার চিহ্ন—যিনি দুঃসময়ে তাঁর পাশে ছিলেন এবং সাহস জুগিয়েছিলেন।

বর্তমানে এমন অনেক পুরুষ আছে, যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়—

[১৪] মুসলিম (২০২/১৫) এর ব্যাখ্যায় নববী (রাহ.)

[১৫] আদাবুল মুফরাদ (২৩২)

[১৬] হাকিম নাসাঈ (১৭/১)



যেখানে তাদের স্ত্রী কঠিন সময়ে তাদের পাশে থেকে সাহায্য করে এবং ধৈর্যের সাথে তাদের প্রতিষ্ঠা-লাভে এগিয়ে আসে। নবীজি ﷺ তাঁর স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং এর যথার্থ প্রতিফলন দেখিয়েছেন তাঁর আচরণে।

## স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে কুঠাবোধ করতেন না

আল্লাহর রাসূল ﷺ খাদিজা রাযি. সম্পর্কে বলেন, “তার প্রতি ভালোবাসা আল্লাহ নিজেই আমার হৃদয়ে গেঁথে দিয়েছেন।” <sup>১৭</sup>

নববী রাহ. বলেন, “এ-হাদীস এটিই ইঙ্গিত করে আল্লাহর এ-অনুমোদন খাদিজার (নবীজির ﷺ প্রতি) ভালোবাসাপূর্ণ আচরণের কারণেই সম্ভব হয়েছে।” <sup>১৮</sup>

আয়িশার জন্য আল্লাহর রাসূলের ﷺ ভালোবাসা অনেক সুস্পষ্ট ও সুবিদিত ছিল। নবীজি ﷺ কাউকে তার মতো ভালোবাসেননি এবং কেবল তাকেই তিনি কুমারী হিসাবে বিয়ে করেছিলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তার জন্য তার ভালোবাসা কখনোই লুকাতেন না।

আমর ইবনে আল-আস রাযি. আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাস করলেন, “‘মানুষের মধ্যে কে আপনার সবচেয়ে প্রিয়?’ নবীজি ﷺ বললেন, ‘আয়িশা।’ তিনি (আমর) তখন জিজ্ঞেস করলেন, ‘পুরুষদের মধ্যে কে?’ তিনি ﷺ বললেন, ‘তার বাবা।’” <sup>১৯</sup>

নবীজির ﷺ সুনাতের বাইরে গিয়ে অনেক ব্যক্তি স্ত্রীর প্রতি বছরের পর বছর ভালোবাসার কথা জানায় না। অনেকে তো স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার প্রকাশকে বেমানান ও অপুরুষোচিত মনে করে। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা ব্যক্ত করা এমন এক কাজ, যার মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক মমতাপূর্ণ ও শক্তিশালী হয় এবং সুখী পারিবারিক জীবন লাভ করা সম্ভব হয়। স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসায় সিক্ত রাখবে এবং মাঝে মাঝেই তাঁকে ভালোবাসার কথা জানাবে—এমনটি মেয়েরা খুব পছন্দ করে। দুর্ভাগ্যবশত কিছু নারী কেবলমাত্র মিষ্টি মিষ্টি কথার কারণেই অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে, যা তারা কখনোই তাদের স্বামীর কাছ থেকে পায় না।

[১৭] মুসলিম (২৪৩৫)

[১৮] মুসলিম (২০১/১৫) গ্রন্থের ব্যাখ্যা, নববী (রাহ.)

[১৯] বুখারী (৩৬৬২) ও মুসলিম (২৩৮৪)



## বাগা থেকে বের হবার সময় স্ত্রীকে চুমো দিতেন

উরওয়া রাযি. তার খালা আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, “আয়িশা রাযি. বলেন, ‘নবীজি ﷺ তাঁর স্ত্রীদের চুমো দিয়ে উযু না করেই জামাআতের সাথে সালাতের জন্য বেরিয়ে যেতেন।’ আমি বললাম, ‘এটি নিশ্চয়ই আপনার ক্ষেত্রে হতো।’ তিনি শুনে হেসে উঠলেন।” ২০

নবীজি ﷺ সাওম রেখেও তাঁর স্ত্রীদের চুমো দিতেন। ২১ আয়িশা রাযি. বলেন, “নবীজি ﷺ সাওম রেখে তাঁর স্ত্রীদের চুমো দিতেন এবং আলিঙ্গন করতেন। আর তোমাদের মধ্যে প্রবৃত্তির উপর সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ তাঁরই ছিল।” ২২

## আয়িশা রাযি. পান করার পর তার পান করার স্থানে ঠোঁট লাগিয়ে পান করতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “ঋতুবতী অবস্থায় আমি পান করে (পাত্রটি)

[২০] তিরমিযী (৭৯), আবু দাউদ (১৭৮), নাসাঈ (১৭০) ও ইবনে মাজাহ (৫০২)

[২১] উত্তেজনা ব্যতিরেক নিজ স্ত্রীকে সিয়ামরত অবস্থায় চুমু দেয়া জাযিজ। এতে সিয়ামের কোন সমস্যা হয় না। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন-

يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان املككم لاربه

অর্থাৎ - রাসূলুল্লাহ সিয়ামরত অবস্থায় চুমু খেতেন এবং সিয়ামরত অবস্থায় আলিঙ্গন করতেন। তবে নিজ আবেগ উত্তেজনার উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ ছিল তোমাদের সকলের চেয়ে বেশি। [বুখারী - ১৯২৭]

তবে যুবকদের এটা থেকে নিরাপদ থাকাই শ্রেয়।

কেননা হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

أن رجلا سأل النبي ﷺ عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب

অর্থাৎ - জৈনিক ব্যক্তি নবী ﷺ কে সিয়ামরত অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বনের ব্যপারে প্রশ্ন করলে তিনি অনুমতি দেন। ইতাবসরে অপর একজন এরূপ প্রশ্ন করলে তাকে নিষেধ করেন। তখন আমরা দেখলাম যে, যাকে অনুমতি দিলেন তিনি ছিলেন বৃদ্ধ আর যাকে নিষেধ করেন তিনি ছিলেন যুবক। [আবু দাউদ-২৩৮৭]

অনেক মুহাক্কিক উলামায়ে কিরাম বলেন, মূলত এখানে বয়সের চেয়ে কারো উত্তেজিত হওয়ার সম্ভাব্যতা দেখে হুকুম নির্ধারণ হবে। সাধারণত বৃদ্ধ লোকের উত্তেজিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় তাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে আর যুবককে নিষেধ করা হয়েছে; যেহেতু যুবকদের শারীরিক উত্তেজনা প্রবল থাকে। তবে কেউ যদি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণের ব্যপারে আত্মবিশ্বাস রাখে তবে তার জন্য জাযিজ। - সম্পাদক

[২২] বুখারী (১৯২৭) ও মুসলিম (১১০৬)

নবীজির ﷺ হাতে দিলে আমি যেখানে মুখ লাগাতাম, তিনি পাত্রের সে-জায়গাতেই মুখ লাগিয়ে পান করতেন। আমি কোনো হাড় থেকে মাংস খেলে তিনি হাড়ের সেখানেই মুখ লাগিয়ে খেতেন, যেখানে আমি খেয়েছি।” ২৩

আলি আল-কারী রাহ. বলেন, “আয়িশার রাযি. প্রতি ভালোবাসা দেখানোর জন্য তিনি ﷺ তার প্রতিটি পদচিহ্ন অনুসরণ করতেন।” ২৪

এটি বলার অপেক্ষা রাখে না, রাসূলের ﷺ এই সুন্নাত অনুসরণ করলে স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসতে বাধ্য।

## আয়িশার রাযি. উরুতে মাথা রেখে ঘুমাতেন

আয়িশা রাযি. বলেন, “আমরা একবার নবীজি ﷺ সঙ্গে সফরে বের হয়েছিলাম। সে-বার আমার গলার হার ভেঙে (হারিয়ে) গেল। আল্লাহর রাসূল ﷺ অন্য লোকদের সঙ্গে নিয়ে খুঁজলেন। সে-স্থানে কোনো জলাধার ছিল না, আবার লোকদের কাছে কোনো পানিও ছিল না। আবু বাকর রাযি. এসে আমাকে বকতে লাগতেন। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার উরুতে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। আবু বাকর আমাকে বকতে বকতে পাশ বরাবর ঝাঁকতে লাগলেন। আমার তখন কিছু করার ছিল না, কারণ, নবীজি ﷺ আমার উরুর উপর ঘুমিয়ে ছিলেন।” ২৫

আয়িশা রাযি. আরও বলেন, “ঋতুবতী অবস্থায় আমার উরুর ওপর নবীজি ﷺ মাথা রেখে ঘুমাতেন। তারপর ঘুম থেকে উঠে তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন।” ২৬

এই রেওয়ায়েত নবীজির ﷺ উন্নত চরিত্র ও আখলাকের প্রতিফলন। এ থেকে আমরা আরও শিক্ষা পাই, মাসিক অবস্থায় স্ত্রীকে স্পর্শ করা, তার সাথে বসা ও খাওয়াদাওয়া করা থেকে বিরত থাকা অনুচিত।

[২৩] মুসলিম (৩০০)

[২৪] মিরকাত আল-মাফাতীহ (৪৮৭/২)

[২৫] বুখারী (৪৬০৭) ও মুসলিম (৫৫০)।

[২৬] বুখারী (৩৬৭২) ও মুসলিম (২৬৭)।



## একই চাদরের নিচে স্ত্রীর সঙ্গে ঘুমোতেন

নবীজির ﷺ আরেক স্ত্রী উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত, “একবার এক পশমি চাদরের নিচে আমি নবীজির ﷺ সঙ্গে শুয়ে ছিলাম; সে-অবস্থায় আমার মাসিক শুরু হলো। চাদর থেকে আস্তে করে বের হয়ে আমার মাসিকের কাপড় পরলাম। তিনি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার কি ঋতুশ্রাব হয়েছে?’ আমি বললাম, ‘হ্যাঁ।’ তিনি আমাকে ডাকলেন, আমি আবার চাদরের ভেতর শুয়ে পড়লাম।” ২৭

নবী রাহ. বলেন, “সম্ভবত তিনি আশঙ্কা করছিলেন মাসিকের রক্ত হয়তো নবীজির ﷺ গায়ে লেগে যাবে, তাই আস্তে করে বের হয়ে গিয়েছিলেন। এটিও হতে পারে যে, তিনি রক্ত আসায় বিরক্ত হয়ে কাপড় পরিবর্তন করে পরিষ্কার কাপড় পরার জন্য বের হয়েছিলেন।” ২৮

নবীজির ﷺ স্ত্রী মায়মুনা রাযি. থেকে বর্ণিত, “মাসিক অবস্থায়ও আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে আমি শুয়ে থাকতাম এবং আমাদের মাঝখানে কাপড় থাকত।” ২৯

অনেক ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে মাসিক অবস্থায় দূরত্ব বজায় রাখে এবং একসাথে ঘুমায় না পর্যন্ত। এটি রাসূলের ﷺ সুন্যাহর পরিপন্থী। এটি মেয়েদের মানসিকভাবেও আঘাত দেয়। কারণ, মাসিকের সময় মানসিকভাবে মেয়েরা বিপর্যস্ত থাকে এবং খুব দ্রুত মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এ-অবস্থায় স্বামী যদি তার থেকে দূরে থাকে, তবে সেটি তার জন্য আরও কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়, তাকে আরও বিষণ্ণ করে তোলে।

## স্ত্রীর সাথে একই পাত্র থেকে গোসল করতেন

আয়িশা রাযি. বলেন, “আমি আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। তিনি আমার আগে পানি নেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতেন, আর আমি তাঁর আগে নেওয়ার জন্য। তিনি ﷺ বলতেন, ‘আমার জন্য রাখো।’ আমি বলতাম,

[২৭] বুখারী (২৯৮) ও মুসলিম (২৯৬)।

[২৮] মুসলিম গ্রন্থের (২০৭/৩) ব্যাখ্যায় নবী (রাহ.)।

[২৯] মুসলিম (২৯৫)।



‘আমার জন্য রাখুন।’” ৩০

উন্মে সালামা থেকে বর্ণিত, “মাসিক অবস্থাতেও আল্লাহর রাসূল ﷺ ও আমি একই পাত্রে থেকে গোসল করতাম।” ৩১

## আদর করে স্ত্রীদের উপনামে ডাকতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “একদিন কিছু হাবশি বালক মসজিদে ঢুকে খেলতে শুরু করল। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, ‘হুমাইরা ৩২, তুমি কি তাদের (খেলা) দেখবে?’ আমি বললাম, ‘হ্যাঁ।’” ৩৩

কাজি ‘আইয়্যায রাহ. বলেন, “এভাবে উপনাম দিয়ে তিনি ﷺ তাঁর প্রেম ও ভালোবাসার প্রকাশ করতেন।” ৩৪

## স্ত্রীদের নিয়ে দাওয়াত কবুল করতেন

আনাস থেকে বর্ণিত, “আল্লাহর রাসূলের ﷺ এক ফার্সি (বংশোদ্ভূত) প্রতিবেশী ছিল, সে ছিল সুপ তৈরিতে দক্ষ। একবার সে আল্লাহর রাসূলের ﷺ জন্য সুপ প্রস্তুত করে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে এল। তিনি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, ‘আয়িশারও কি দাওয়াত আছে, সেও কি আমন্ত্রিত?’ সে বলল, ‘না।’ তখন আল্লাহর রাসূলও ﷺ বললেন, ‘না (তিনি আমন্ত্রণ কবুল করবেন না)।’ সে আবার তাঁকে ﷺ আমন্ত্রণ জানাতে ফিরে এল। আল্লাহর রাসূল ﷺ আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘এখানে কি আয়িশারও আছে, সেও কি আমন্ত্রিত?’ সে বলল, ‘না।’ আল্লাহর রাসূলও ﷺ আবার বললেন, ‘না (তিনি আমন্ত্রণ কবুল করবেন না)।’ সে আবার তাঁকে ﷺ আমন্ত্রণ জানাতে ফিরে এল। আল্লাহর রাসূল ﷺ আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘এখানে তো আয়িশারও আছে, নাকি!’ তৃতীয়বারে লোকটি

[৩০] বুখারী (২৫০) মুসলিম (৩২১) এবং নাসাঈ (২৩৯)।

[৩১] বুখারী (৩২২) ও মুসলিম (৩২২)।

[৩২] এটি একটি উপনাম, যা এসেছে আরবি শব্দ আল-হামরা থেকে—অর্থ : লালচে সাদা রঙ; আয়িশার (রা) গায়ের রঙের জন্য এ-শব্দটি তিনি ﷺ ব্যবহার করেছেন।

[৩৩] সুনান আল-কুবরাতে (৮৯৫১) নাসাঈ।

[৩৪] মাসারিক আল-আনওয়ার (৭০২/১)।

বলল, ‘হ্যাঁ।’ তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তার আমন্ত্রণ কবুল করলেন এবং আয়িশাকে রাখি. নিয়ে তার বাড়িতে গেলেন।” ৩৫

নবী রাহ. বলেন, “আল্লাহর রাসূল ﷺ আয়িশাকে ছাড়া একাই আমন্ত্রণে যাওয়া অপছন্দ করতেন। এ থেকে দেখা যায়, তিনি স্ত্রীদের প্রতি কতটা কোমল ছিলেন এবং তাদের অধিকার কীভাবে রক্ষা করতেন। স্ত্রীদের সাথে সর্বোচ্চ মর্যাদার সাথে তিনি আচরণ করতেন।” ৩৬

## স্ত্রীরা দেখা শেষে চলে যাবার জগয় নিজে এগিয়ে দিতেন

সাফিয়া বিনতে হুওয়াই রাখি. থেকে বর্ণিত, “নবীজি ﷺ ইতিকাফে (ইবাদাতের জন্য বাইরের দুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে মসজিদে অবস্থান করা) ছিলেন এবং আমি রাতে তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম। তাঁর সাথে কথা বলে আমি উঠে এলাম। তিনি ﷺ আমার সঙ্গে উঠে এসে বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এলেন। দুজন আনসারী আমাদের পাশ দিয়ে গেল। নবীজিকে ﷺ দেখে তারা যাওয়ার গতি বাড়াল। নবীজি ﷺ বলে উঠলেন, ‘থামো, সে সাফিয়া বিনতে হুওয়াই (আমার স্ত্রী)।’ তারা বললেন, ‘সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর রাসূল (আমরা আপনার সম্পর্কে কোনো সন্দেহ করি না!)’ এ-কথা শুনে নবীজি ﷺ বললেন, ‘শয়তান মানুষের রক্তের মধ্যে দিয়ে চলে। আমার আশঙ্কা হলো, সে হয়তো সে তোমাদের অন্তরে (সন্দেহ) ওয়াসওয়াসা দেবে।’” ৩৭

আল্লাহর রাসূল ﷺ ইবাদাতে (ইতিকাফ) বিঘ্ন ঘটিয়েও পথে রক্ষার জন্য স্ত্রীকে বাড়ি পর্যন্ত দিয়ে এলেন—যদিও ইতিকাফ অবস্থায় কোনো বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া নিয়ত করার পর মসজিদ থেকে বের হওয়া উচিত না।

## নবীজি ﷺ স্ত্রীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ জীবন কাটিয়েছেন

আল্লাহর রাসূল ﷺ কার্যতভাবেই আল্লাহর কথার বাস্তবায়ন নিজের পারিবারিক

[৩৫] মুসলিম (২০৩৭)।

[৩৬] মুসলিম গ্রন্থের ব্যাখ্যায় (২০৯/১৩) নবী।

[৩৭] বুখারী (২০৩৮) ও মুসলিম (২১৭৫)।



জীবনে করেছেন, “তাদের সাথে দয়াদ্র জীবনযাপন করো।”; (আল কুরআন, ৪:১৯) তাই আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, “মুমিনদের মধ্যে ঈমানে সর্বোৎকৃষ্ট তারাই, যারা ব্যবহারে সর্বোত্তম; আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো তারাই, যারা স্ত্রীদের সাথে ব্যবহারে সর্বোত্তম।” ৩৮

## কখনোই স্ত্রীদের মারেননি বা সমালোচনা করেননি

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর পথে (জিহাদে) ছাড়া কখনোই কোনো খাদেম বা মহিলাকে আঘাত করেননি।” ৩৯

বর্তমান সময়ে এমন অনেক লোক পাওয়া যাবে, যারা তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ কারণে স্ত্রীকে পিটায়, চেহারা ও মাথায় আঘাত করে। মারতে গিয়ে লাঠি, জুতা এবং হাতের কাছে যা পায়, সেটাই কাজে লাগায়।

আইয়্যাস ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, “নারীদের আঘাত করো না।”

উমার রাযি. আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে এসে বললেন, ‘নারীরা তাদের স্বামীদের সাথে অনেক উদ্ধত হয়ে উঠেছে।’ তখন তিনি ﷺ তাদের সামান্যভাবে আঘাতের অনুমতি দিলেন। এরপর অনেক মহিলা রাসূলুল্লাহর ﷺ স্ত্রীদের কাছে এসে (স্বামীদের প্রহারের ব্যাপারে) অভিযোগ করতে লাগল। তিনি ﷺ শুনে বললেন, “অনেক মহিলা মুহাম্মাদের স্ত্রীদের কাছে তাদের স্বামীদের প্রহারের ব্যাপারে অভিযোগ করেছে। যারা (স্ত্রীদের আঘাত) করে, তারা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নয়।” ৪০

আসিম আবাদী রাহ. বলেন, “‘যারা (স্ত্রীদের আঘাত) করে, তারা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নয়’ কথার অর্থ হলো, যারা স্ত্রীদের প্রহার ৪১ করে তারা উত্তম নয়, বরং

[৩৮] তিরমিযী (১০৮২)।

[৩৯] মুসলিম (২৩২৮)।

[৪০] আবু দাউদ (২১৪৬) এবং ইবনে মাজাহ (১৯৮৫)।

[৪১] যখন স্ত্রীর মধ্যে শরীয়তবহির্ভূত কাজ দেখা যাবে এবং স্বামীর অবাধ্যতা শুরু করবে এরকম মুহুর্তে স্বামীর করণীয় হিসেবে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুর আনের সূরা নিসার ৩৪ নাস্বার আয়াতে সমাধান হিসেবে বলেনঃ

وَالَّتِي تُخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَابْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

অর্থাৎ: আর স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশংকা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন

যারা ধৈর্যসহকারে স্ত্রীদের খারাপ বা ভুল আচরণ সহ্য করে এবং তাদের প্রহার করা থেকে বিরত থাকে, তারাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।” ৪২

## নারীদের সাথে অশ্রাব্য ব্যবহার করতে পুরুষদের নির্দেশ দিয়েছেন

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “নারীদের ব্যাপারে আমার নির্দেশ মেনে চলো। নারীদের সাথে দয়ার সাথে আচরণ করো।” ৪৩

নবী রাহ. বলেন, “এই রেওয়াজে নারীদের দয়া করা এবং তাদের ভুল আচরণ সহ্য করে প্রতিদানে কোমল ব্যবহার করার প্রতি উৎসাহ দেয়া।” ৪৪

আল্লাহর রাসূল ﷺ আরও বলেন, “নারীদের পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা একে সোজা করতে গেলে ভেঙে ফেলবে। তাই তার ব্যবহার সহ্য করে চলো, তার সাথে সুখে বসবাস করতে পারবে।” ৪৫

নারীদের সাথে ভালো ব্যবহার করার ব্যাপারে নবীজি ﷺ বারবার পুরুষদের

কর এবং তাদেরকে প্রহার করা

মুফাসসীর কিরাম এই অংশের ব্যাখ্যাতে বলেন, স্ত্রীদের পক্ষ থেকে যদি নাফরমানী সংঘটিত হয় কিংবা এমন আশংকা দেখা দেয়, তবে পর্যায়ক্রমে তিনটি পর্যায়ে সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে।

প্রথম পর্যায়ে নরমভাবে বোঝাবে। যদি এতে সংশোধন না হয়, তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের বিছানা নিজের থেকে পৃথক করে দেবে। যাতে এই পৃথকতার দরুন সে স্বামীর অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে পারে। এতেও যদি সংশোধন না হয়, তবে তৃতীয় পর্যায়ে এসে মৃদুভাবে মারবে। আর তার সীমা হল এই যে, শরীরে যেন সে মারধরের প্রতিক্রিয়া কিংবা যখম না হয়। কিন্তু এই পর্যায়ের শাস্তি দানকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করেননি, বরং তিনি বলেছেন: ‘তাল লোক এমন করে না’। [ইবন হিব্বান : ৯/৪৯৯, নং- ৪১৮৯, আবু দাউদ : ২১৪৬, ইবন মাজাহ : ১৯৮৫]

বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীর ইবনু কাসীর এ অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন।

তবে স্বামীদের স্মরণে থাকা উচিত, মহব্বত তরবারির চেয়ে কার্যকর। তাই মহব্বতে যদি কাজ না হয় প্রহারে সংশোধন হওয়ার নিশ্চয়তা স্কীণ। মূলত নারী মন খুবই নরম আর ভালোবাসা প্রিয়। স্বামী থেকে যদি সুন্দরভাবে ভালোবাসা প্রকাশ করা হয় এবং স্ত্রীকে সুন্দরভাবে বোঝানো হয়, এতেই সংশোধন হয়ে যাওয়ার কথা। মূলত আমাদের সমাজে প্রথম দুই পর্যায়ের সংশোধন পদ্ধতি অনুসরণ না করে শুরুতেই তৃতীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। আর এর ফলাফলও বিপরীত হয়। কিন্তু স্বামী যদি ন্যায়পথে থাকে ও স্ত্রী যদি সবগুলো পর্যায় প্রয়োগের পরেও সংশোধিত না হয় তবে সেখানে স্ত্রীকে ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি আছে, আর না হয় স্বামী অন্য স্ত্রী গ্রহণ করবে।

আল্লাহ আমাদের কুরআনি পদ্ধতিতে সকল সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হওয়ার তাউফিক দান করুক। - সম্পাদক

[৪২] ‘আওন আল-মা’বুদ (১৩০/৬)।

[৪৩] বুখারী (৩৩৩১) ও মুসলিম (১৪৬৮)।

[৪৪] মুসলিম গ্রন্থের ব্যাখ্যায় (৫৭/১০) নববী।

[৪৫] আহমদ (১৯৫৮৯)।



নির্দেশ দিয়েছেন। বিদায় হজ্বের ভাষণে তিনি ﷺ বিশেষভাবে বলেছেন, “নারীদের সাথে কোমল আচরণ করো; কেননা, তারা তোমাদের কাছে বন্দির মতো।” <sup>৪৬</sup>

আল্লাহর রাসূল ﷺ নারীদের ব্যাপারে এ-কথাগুলো বহুবার বলেছেন। কারণ, তিনি জানতেন, প্রকৃতিগতভাবেই নারীদের দ্বারা স্বামীরা কষ্ট পাবে এবং খুব কম মানুষই সবরের সাথে তা সহ্য করবে। বরং অনেকেই তাদের ব্যবহারে রেগে যাবে এবং তা বিচ্ছেদ ও পরিবার-ভাঙনের দিকে নিয়ে যাবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাই পারিবারিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখার কৌশল পুরুষদের শিখিয়ে দিয়েছেন। আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “একজন মুমিন কখনোই যেন একজন মুমিন নারীকে (তার স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে। যদি সে তার কোনো কিছু অপছন্দ করে, তবে তার এমন গুণও তো রয়েছে যা সে পছন্দ করে।” <sup>৪৭</sup>

নববী রাহ. বলেন, “এর অর্থ হলো, তার ঘৃণা করা অনুচিত; কারণ, স্ত্রীর মাঝে যেমন তার অপছন্দনীয় বিষয় আছে, তেমনি এমন অনেক গুণও আছে, যা তার পছন্দনীয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন মহিলা হয়তো অনেক রূঢ়ভাষী, কিন্তু একই সাথে সে অনেক দীনদার, সতী-সাধবী।” <sup>৪৮</sup>

নবীজি ﷺ সব সময় তাঁর স্ত্রীদের সাথে নম্র আচরণ করতেন। তাঁর সংসারজীবনও সে-কারণে ছিল অনেক আনন্দঘন। নবীজি ﷺ তাদের খুশিতে রাখার চেষ্টা করতেন, তাদের সঙ্গে বসতেন, মজা করতেন, পরামর্শ করতেন, তাদের কথা শুনতেন এবং তাদের ভুল-ত্রুটিগুলো উপেক্ষা করতেন।

শুধু তা-ই নয়, অন্যদের তিনি স্ত্রীদের আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিতেন। আবু যর রাযি. থেকে বর্ণিত, “আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, “খুব শীঘ্রই আপনি মিশর জয় লাভ করবেন। এটি এমন এক দেশ, যা কিরাতের <sup>৪৯</sup> দেশ নামে পরিচিত। আপনি যখন এ-দেশ বিজয় করবেন, তখন এর অধিবাসীদের সাথে ভালো ব্যবহার করবেন। কারণ, তাদের সাথে আমাদের রক্তসম্পর্কীয় দায়িত্ব যেমন আছে,

[৪৬] তিরমিযী (১০৮৩) এবং ইবনে মাজাহ (১৮৫১)।

[৪৭] মুসলিম (২৬৭২)।

[৪৮] মুসলিম গ্রন্থের (৫৮/১০) ব্যাখ্যায় নববী (রাহ.)।

[৪৯] সেখানে ব্যবহৃত একধরনের মুদ্রা।

তেনি বৈবাহিক সম্পর্কগত দায়িত্ব রয়েছে।” ৫০

নবী রাহ. বলেন, “‘রক্তসম্পর্কীয় দায়িত্ব’-এর অর্থ হলো, তাদের দেশের অধিবাসী ছিলেন হাজেরা, ইসমাইলের (আলাইহিস সালাম) মা। ‘বৈবাহিক সম্পর্কের দায়িত্ব’-এর অর্থ হলো, নবীজি ﷺ সে-দেশের একজন নারীকে বিয়ে করেছিলেন (তাঁর ছেলে ইবরাহীমের মা—মারিয়াম)।” ৫১

## স্ত্রীদের অনুভূতির ব্যাপারে ঈনোযোগী ছিলেন

নবীজি ﷺ স্ত্রীদের মন ভালো কিংবা খারাপ আছে কি না খেয়াল রাখতেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ﷺ আয়িশাকে রাযি. বললেন, “আমি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারি, কখন তুমি আমার উপর খুশি থাক, আর কখন মন খারাপ করে থাক।” আয়িশা রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, “কীভাবে বুঝতে পারেন?” তিনি ﷺ উত্তর দিলেন, “যখন তুমি সন্তুষ্ট থাক, তখন শপথের সময় বল, ‘মুহাম্মাদের রবের কসম’, আর যখন মন খারাপ কর, তখন বলো, ‘ইবরাহীমের রবের কসম।’” আয়িশা রাযি. বললেন, “হ্যাঁ, (আপনি ঠিক ধরেছেন) আল্লাহর রাসূল, সে ক্ষেত্রে শুধু আপনার নাম উচ্চারণ করা থেকেই বিরত থাকি।” ৫২

আল্লাহর রাসূলকে ﷺ রাষ্ট্র দেখাশোনা, যুদ্ধ, সৈন্যবহরের প্রস্তুতি, আল্লাহর বাণী পৌঁছানো, বিভিন্ন দেশে দূত পাঠানোসহ নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হতো। এত-শত ভারী ভারী দায়িত্বের চাপে থেকেও তিনি স্ত্রীদের খোঁজ নিতে ভুলতেন না, তাদের অনুভূতিগুলোর ব্যাপারে সচেতন থাকতেন।

স্ত্রীদের অনুভূতির ব্যাপারে তাঁর যত্নের আরেকটি ঘটনা। তাঁর দুই স্ত্রীর মাঝে একবার মনোমালিন্য হলো। হাফসা রাযি. সাফিয়াকে রাযি. ইহুদীকন্যা বলায় সাফিয়া কষ্ট পেলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে নবীজির ﷺ কাছে অভিযোগ জানালেন। নবীজি ﷺ তার পক্ষ নিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা জানালেন এবং তাঁর কথা শুনে সাফিয়া খুশি হয়ে গেলেন।

[৫০] মুসলিম (২৫৪৩)।

[৫১] মুসলিম গ্রন্থের (৯৭/১৬) ব্যাখ্যায় নবী (রাহ.)।

[৫২] বুখারী (৫২২৮) ও মুসলিম (২৪৩৯)।



নবীজির ﷺ ভালোবাসার আরেকটি উদাহরণ সাফিয়্যার রাযি. উটের ঘটনা। সাফিয়্যা রাযি. থেকে বর্ণিত, “নবীজি ﷺ একবার হজ্জের সফরে তাঁর স্ত্রীদের নিয়ে বের হলেন। সফরের একপর্যায়ে চালক উটের গতি বাড়িয়ে দিল। নবীজি ﷺ তাকে বললেন, “ভঙ্গুর পাত্রগুলো (নারীরা) আছে, সাবধান!” একবার আমার উট (অসুস্থতার কারণে) থেমে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। আমি কাঁদতে লাগলাম। এ-সংবাদ পেয়ে রাসূল ﷺ চলে এলেন। আমার চোখের পানি তাঁর হাত দিয়ে মুছে দিলেন।” ৫৩

স্ত্রীর চোখের পানি নিজের হাতে মুছে দেওয়ার মাধ্যমে তার প্রতি ভালোবাসার এক নির্মল বহিঃপ্রকাশ করা সম্ভব। সাফিয়্যার রাযি. কান্নার কারণ তেমন কোনো বড় কিছু ছিল না, রাসূল ﷺ এ-তুচ্ছ ব্যাপারকেও তুচ্ছ হিসেবে দেখেননি, বরং তার চেহারায তাঁর হাতের মমতার পরশ বুলিয়ে দিয়েছেন। ভালোবাসা প্রকাশের এ-সামান্য সুযোগকেও তিনি হাতছাড়া করেননি।

## অসুস্থ অবস্থায় স্ত্রীদের সান্ত্বনা দিতেন

বিদায় হজ্জের সময় আয়িশার রাযি. মাসিক শুরু হলো। কষ্টে তার চোখে পানি চলে এল। আল্লাহর রাসূল ﷺ ঘরে ঢুকে তার চোখে পানি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কাঁদছ কেন? তোমার মাসিক শুরু হয়েছে?” আয়িশা রাযি. বললেন, “হ্যাঁ।” নবীজি ﷺ জবাব দিলেন, “এটা এমন একটি ব্যাপার, যা আল্লাহ নারীদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। একজন হজ্জের সময় যা করে, সব কিছুই করতে থাকো, শুধু তাওয়াফ করো না।”

পরে তার মাসিক শেষ হলে তিনি হজ্জ সম্পন্ন করলেন। মাসিকের কারণে তার উমরার বাদ পড়ে-যাওয়া কাজগুলো তিনি শেষ করতে চাইলেন। নবীজি ﷺ (আয়িশার ভাই) আব্দুর রহমানকে তানঈম এলাকায় তাকে নিয়ে ইহরাম শেষ করানোর জন্য যেতে বললেন। ৫৪

নারীদের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে পুরুষদের খেয়াল রাখা উচিত, বিশেষ করে মাসিক ও নিফাসের সময়। নারীরা বিভিন্ন ব্যথা-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে প্রায়ই সময়

[৫৩] আহমাদ (২৬৩২৫)।

[৫৪] বুখারী (৩১৬) ও মুসলিম ১২১১)।

কাটায়, ফলে তার মানসিক অবস্থারও দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। স্বামী যদি বিশেষ করে এ-সময়গুলোতে তার প্রতি সহানুভূতি দেখায়, তবে স্ত্রী তার এ-ভালোবাসার কারণে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে।

## স্ত্রী অসুস্থ হলে রুকইয়াহ করতে

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “স্ত্রীদের কেউ অসুস্থ হলে নবীজি ﷺ তাকে দেখতে যেতেন এবং তার ওপর ডান হাত রেখে রুকইয়াহ (অর্থাৎ নির্দিষ্ট দুআ ও কুরআনের আয়াত) পড়তেন। তিনি ﷺ পড়তেন,

لِّلّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اَذْهَبِ الْبَاسَ اشْفِهِ وَاَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ اِلَّا  
شِفَاؤُكَ شِفَاءَ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

হে আল্লাহ—মানবজাতির প্রভু, এই রোগ সারিয়ে দিন এবং (তাকে) আরোগ্য দিন! আপনিই তো মহান শিফাদাতা। আপনি ছাড়া কেউ রোগ থেকে শিফা দেওয়ার যোগ্যতা রাখে না।” ৫৫

স্বামী যখন স্ত্রীকে ব্যথার জায়গা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, করুণার সঙ্গে তার হাত সে-জায়গায় রাখে এবং রুকইয়াহ করে, তখন স্ত্রীর মনে তা গভীরভাবে রেখাপাত করে। এমনকি ব্যথার উপশমে এ-সব সাহায্য না করলেও সে মনে রাখে, তার স্বামী তার দেখাশোনা করে, তার কষ্ট বোঝে এবং তার প্রতি সহানুভূতিশীল।

আয়িশা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত উন্মে জারের গল্পে এগারোজন নারীর একজন তার স্বামীর ব্যাপারে বলেছিল “সে কখনোই আমার কষ্টে হাত বাড়ায়নি।” ৫৬

ইবনে হাজার রাহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন, “সে তার অবিবেচক স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করছিল এবং কঠোর মনের অধিকারী হিসেবে বর্ণনা করেছিল।” ৫৭

এমন অনেক স্বামীই আছে, যারা স্ত্রীর শারীরিক-মানসিক ব্যাপারে কোনো তোয়াক্কা করে না। অনেকে তো স্ত্রীর অসুস্থতাকেও বিরক্তি প্রকাশ করে। স্ত্রীরা স্বামীদের

[৫৫] বুখারী (৫৭৪৩) ও মুসলিম (২১৯১)।

[৫৬] বুখারী (৫১৮৯) ও মুসলিম (২৪৪৮)।

[৫৭] ফাতহুল বারী (২৬৩/৯)।



মতোই নানা সমস্যাসঙ্কুল কঠিন সময় পার করে। এ-সময়গুলোতে তার পাশে থেকে স্বামীদের উচিত শান্তির পরশ বুলিয়ে দেওয়া, নির্ভর রাখার চেষ্টা করা। ভালোবাসার সুরে কথা বলা। স্ত্রীর সাথে এমনভাবেই আচরণ করা উচিত, যেন সে বুঝতে পারে জীবনযুদ্ধে সে একা নয়, তার রয়েছে নিরাপদ আশ্রয়স্থল। একজন নারী বাবা, মা বা ভাইয়ের মতো খুব নিকটাত্মীয়কে হারাতে পারে—এ-সময় তার স্বাস্থ্যনার অনেক প্রয়োজন পড়ে; কিন্তু এ-সামান্য ব্যাপারটিও অনেক স্বামী বুঝতে পারে না, স্ত্রীর কষ্টে তার কোনো ভাবান্তর হয় না; এমন পাষণ-হৃদয় স্বামীও পাওয়া যাবে, যারা আরও একধাপ এগিয়ে স্ত্রীর কষ্টকে তাচ্ছিল্যের ভাষায় উড়িয়ে দেয়, এমনকি তা নিয়ে মজাও করে বসে।

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী, আমি এতিম ও মহিলা—এই দুই শ্রেণির অধিকার (এবং এর সংক্রান্ত আহকাম) সম্পর্কে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছি।” ৫৮

## স্ত্রীর অনুপযুক্ত আচরণও সহ্য করতেন

নুমান ইবনে আল-বশির থেকে বর্ণিত, “আবু বাকর রাযি. আল্লাহর রাসূলের ﷺ ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। এ-সময় বাইরে থেকে তিনি শুনতে পেলেন আয়িশা রাযি. রাসূলুল্লাহর ﷺ চেয়ে উঁচু গলায় কথা বলছে। ঘরে প্রবেশের অনুমতি পেয়ে তিনি আয়িশাকে রাযি. (কিছুটা রাগান্বিত হয়ে) নিজের দিকে টেনে বললেন, “তোমার সাহস কত! আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে উঁচু গলায় কথা বল!” আল্লাহর রাসূল ﷺ (তাকে রক্ষা করার জন্য) তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। আবু বাকর রাযি. চলে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে (সান্ত্বনা দিয়ে) বললেন, “দেখলে, কীভাবে তোমাদের মাঝে এসে তোমাকে রক্ষা করলাম!” কিছুক্ষণ পর আবু বাকর ফিরে এসে তাঁদের দুজনকে হাস্যোজ্জ্বল দেখলেন। আবু বাকর বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল, আপনাদের যুদ্ধে যেমন শরিক হয়েছিলাম, আপনাদের খুশিতেও তেমনি আমাকে শরিক করুন।” ৫৯

[৫৮] ইবনে মাজাহ (৩৬৭৮)।

[৫৯] আহমাদ (১৭৯২৭)।

## স্ত্রী সারাদিন দূরে থাকলে তা গত্য করতেন

উমার রাযি. বলেন, “আমরা কুরাইশরা স্ত্রীদের ওপর প্রভাবশালী ছিলাম, কিন্তু মদীনায়ে এসে দেখলাম, এখানে স্ত্রীরা স্বামীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে রাখে। আমাদের স্ত্রীরা তাদের দেখে এসব শিখতে লাগল। একদিন আমি আমার স্ত্রীর ওপর রেগে গেলাম এবং আমার স্ত্রী আমার সাথে তর্ক করতে লাগল। আমি আরও রেগে গেলাম। তার তর্ক করা আমার একদমই সহ্য হলো না। (এটা দেখে) সে আমাকে বলল, ‘আমার কথার পিঠে কথা বলা আপনার পছন্দ হচ্ছে না, কিন্তু আল্লাহর শপথ, রাসূলুল্লাহর ﷺ স্ত্রীরা তার কথার পিঠে কথা বলে। এমনকি কেউ কেউ তো রাত না হওয়া পর্যন্ত সারাদিন রাসূল ﷺ থেকে দূরে থাকে।’ আমি (এ-কথা শুনে) দ্রুত (আমার মেয়ে) হাফসার সাথে দেখা করতে গেলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তোমাদের কেউ কি নবীজির ﷺ কথার পিঠে কথা বলে?’ সে উত্তর দিল, ‘হ্যাঁ।’ তারপর জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি কখনো রাত না আসা পর্যন্ত তার থেকে নিজেকে সারা দিন পৃথক রাখ?’ সে উত্তর দিল, ‘হ্যাঁ।’” ৬০

ইবনে হাজার রাহ. বলেন, “এই রেওয়াজে প্রমাণ করে যে, নারীদের সাথে কঠিন আচরণ করা নিন্দনীয়। কারণ, নবীজি ﷺ নারীদের সঙ্গে ব্যবহারে আনসারদের প্রথা মেনে নিয়ে তার নিজের লোকদের (কুরাইশ) প্রথা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ থেকে আরও বোঝা যায় যে, স্ত্রীর সাথে ধৈর্যসহ আচরণ করা উচিত এবং তার ভুলগুলো ক্ষমা করে দেওয়া উচিত; কিন্তু সেটি যদি আল্লাহর অধিকার হয়, তবে তা ভিন্ন কথা।” ৬১

## বাগার কাজে স্ত্রীদের সাহায্য করতেন

আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত, আয়িশাকে রাযি. জিজ্ঞাসা করা হলো, “রাসূলুল্লাহ ﷺ বাড়ির ভেতরে কী কী কাজ করতেন?” তিনি জবাব দিলেন, “নবীজি ﷺ স্ত্রীদের কাজে সাহায্য করতেন এবং সালাতের সময় হলে উঠে চলে যেতেন।” ৬২

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “নবীজি ﷺ তো একজন মানুষই ছিলেন, যিনি নিজেই

[৬০] বুখারী (৮৯) ও মুসলিম (১৪৭৯)।

[৬১] ফাতহুল বারী (২৯১/৯)।

[৬২] বুখারী (৬৭৬)।



নিজের কাপড় সেলাই করতেন, ভেড়ার দুধ দোয়াতেন এবং পুরুষরা বাসায় সচরাচর যে-সব কাজ করে, সেগুলো করতেন।” ৬৩

আরেক বর্ণনায় আছে, “নবীজি ﷺ নিজের জামা নিজে ধুতেন, নিজের জুতা নিজে মেরামত করতেন এবং পুরুষরা বাসায় সচরাচর যে-সব কাজ করে, সেগুলো করতেন।” ৬৪

বর্তমান সময়ে কিছু পুরুষ আছে, যারা স্ত্রীর ঘাড়ে তার সাথের অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে দেয়। তাকে ক্লান্ত বা অসুস্থ দেখেও তার কোনো ভাবান্তর হয় না, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় না। এমন আচরণ অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ নির্দেশের পরিপন্থী।

## বাহনে উঠতে স্ত্রীকে সাহায্য করতেন

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, “একবার দেখলাম, সাফিয়া রাযি. উটে ওঠার চেষ্টা করছেন। এটা দেখে নবীজি ﷺ তাকে তাঁর নিজের গাউন দিয়ে ঢেকে দিলেন (যেন ওঠার সময় আওরাহ ৬৫ অসাবধানতাবশত উন্মুক্ত হয়ে না পড়ে), তারপর উটের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন, যেন তাঁর হাঁটুর ওপর পা রেখে তিনি উটে উঠতে পারেন।” ৬৬

এ থেকে বোঝা যায়, স্ত্রীদের সাথে নবীজির ﷺ আচরণ কতটা কোমল ও ভালোবাসাপূর্ণ ছিল।

## শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও জুবাগের ব্যাপারে খেয়াল রাখতেন

বাসায় ফিরেই আল্লাহর রাসূল ﷺ মিসওয়াক দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করতেন, যেন তাঁর স্ত্রী তাঁর মুখ থেকে দুর্গন্ধ না পায়। সুরায় ইবনে হানী রাহ. থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশাকে রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, “বাসায় ঢুকে নবীজি ﷺ প্রথম কোন কাজ

[৬৩] আদাবুল মুফরাদ (৫৪১) ও তিরমিযী (১১৩)।

[৬৪] আহমদ (২৪৩৮২)।

[৬৫] আওরাহ শব্দের সাধারণ অর্থ ঢেকে রাখার বস্তু। তবে এখানে আওরাহ বলতে নারীরা ঘর থেকে বের হলে শরীরের যতটুকু ঢাকতে হয় অর্থাৎ পর্দা করতে হয় সেটার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। - সম্পাদক

[৬৬] বুখারী (২৮৯৩) ও মুসলিম (১৩৬৫)।

করতেন?” তিনি উত্তরে বললেন, “মিসওয়াক দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করতেন।” ৬৭

সুযুতী রাহ. বলেন, “তাঁর এরকম অভ্যাসের পেছনে কারণ ছিল সারাদিন বাইরে কথা বলে তাঁর মুখের গন্ধ বদলে যেত। স্ত্রীদের সাথে সুন্দরতম ব্যবহারে রাসূল ﷺ এতটাই যত্নবান ছিলেন যে, এই সামান্যতম দুর্গন্ধ না রাখার ব্যাপারেও তিনি খেয়াল রাখতেন।” ৬৮

## ঘুমা থেকে উঠেই দাঁত ও মুখ পরিষ্কার করতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “নবীজি ﷺ দিনে বা রাতে যখনই ঘুমাতে, ঘুম থেকে উঠে প্রথমে মিসওয়াক করতেন, তারপর উযু করতেন।” ৬৯

আল-কুরতুবী রাহ. বলেন, “ঘন ঘন মিসওয়াক করা যে বেশ পছন্দনীয় সুন্নাহ, এর প্রমাণ এই হাদীস। কারণ, সারা দিন পার হলে মুখের গন্ধ দুর্গন্ধে পরিণত হবে, এটাই স্বাভাবিক।” ৭০

ইবনে কায়্যিম রাহ. বলেন, “রাসূলুল্লাহ ﷺ মিসওয়াক ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন। ঘুম থেকে উঠে, উযুর পূর্বে, সালাতের শুরুতে এবং বাসায় প্রবেশের পর মিসওয়াক করতেন। মিসওয়াকের জন্য তিনি আরাক ৭১ গাছের ডাল ব্যবহার করতেন।” ৭২

ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দাম্পত্য জীবনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ, স্বামী বা স্ত্রীর যে-কারও অপরিচ্ছন্নতার কারণে দুজনের মাঝে রোগ হতে পারে।

## জব জময় জুগুন্নি ব্যবহার করতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “নিজের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হোক, এটি নবীজি

[৬৭] মুসলিম (২৫৩)।

[৬৮] হাসিয়াত, আস-সুযুতি (১০/১)।

[৬৯] আবু দাউদ (৫৭)।

[৭০] আল-মুফহিম (১৩৬/৩)।

[৭১] আরাক গাছ এক প্রকার মরু উদ্ভিদ, যার বৈজ্ঞানিক নাম সালভাডোরা পারসিকা (*Salvadora persica*)। এই গাছের কচি ডাল দিয়ে দাঁত মাজার মিসওয়াক তৈরি হয়। - সম্পাদক

[৭২] যাদুল মা'আদ (১৬৭/১)।



স্ত্রীর জন্য নিজেকে সুশোভিত করতেন ও অন্যদের এ কাজের নির্দেশ দিতেন

ﷺ পছন্দ করতেন না।” ৭৩ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, “নিজের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হলে নবীজি ﷺ সবচেয়ে বেশি মনঃক্ষুণ্ণ হতেন।” ৭৪

নবীজির ﷺ অন্যতম গুণ ছিল সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং তিনি প্রায়শই তা ব্যবহার করতেন। আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন, “তোমাদের দুনিয়ার দুটি জিনিসকে আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় করা হয়েছে—সুগন্ধি আর নারী, আর সালাতকে করা হয়েছে আমার চোখের শীতলতা।” ৭৫

নবীজি ﷺ রসুন ও পেঁয়াজের মতো হালাল জিনিসকে পরিহার করে চলতেন শুধু এ-কারণেই যে, এগুলো মুখে দুর্গন্ধ তৈরি করে। এবার তুলনা করুন সে-সব ধূমপায়ীর কথা, যারা মুখে সিগারেটের গন্ধ নিয়ে বাসায় ফেরে আর তাদের স্ত্রী সর্বোত্তম সাজে সেজে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে; স্বামীর মুখের সিগারেটের দুর্গন্ধ তার মনে কেমন প্রভাব ফেলবে?

## স্ত্রীর জন্য নিজেকে সুশোভিত করতেন ও অন্যদের এ কাজের নির্দেশ দিতেন

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “যার চুল আছে, সে যেন একে সম্মান করে।” ৭৬

আসিম আবাদী বলেন, “এর অর্থ হলো, চুল যেন পরিষ্কার রাখা হয়, তেল দেওয়া হয়, আঁচড়ানো হয় এবং এলোমেলো না রাখা হয়। কারণ সবাই পরিষ্কার-সুন্দর বেশভূষা দেখতে পছন্দ করে।” ৭৭

একজন স্বামীর উচিত স্ত্রীর জন্য উত্তম বেশে সাজা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা। যেমন, ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, “আমি চাই যেমন আমার স্ত্রী আমার জন্য সাজুক, তেমনি আমিও যেন তার জন্য সাজি। কারণ, আল্লাহ বলেন, “পুরুষদের উপর

[৭৩] বুখারী (৬৯৭২) ও মুসলিম (১৪৭৪)।

[৭৪] আল-মুজাম আল-আওসাতে (৮৭৬৪) আত-তাবারানী।

[৭৫] নাসাঈ (৩৯৩৯)।

[৭৬] আবু দাউদ (৪১৬৩)।

[৭৭] ‘আওন আল-মা’বুদ (১১৮৩/৯)।

নারীদেরও অধিকার আছে, যেমন নিয়ম অনুযায়ী পুরুষদের নারীদের উপর অধিকার আছে।” ৭৮ (আল কুরআন, ২: ২২৮) ৭৯

সাহল ইবনে সাদ আল-আনসারী থেকে বর্ণিত, “একবার এক লোক রাসূলুল্লাহর ﷺ কক্ষের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল, তাঁর হাতে একটি চিরুনি এবং সেটি দিয়ে তিনি নিজের চুল ঠিক করছিলেন।” ৮০

## স্ত্রীর কাছে নবীজি ﷺ তাঁর চুল ধুয়ে ও আঁচড়িয়ে নিতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “ইতিকাকের সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার দিকে তার মাথা হেলে দিতেন এবং আমি তার চুল আঁচড়ে দিতাম। ৮১” ৮২

আয়িশা রাযি. আরও থেকে বর্ণিত, “আমার মাসিকের সময়ও আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ চুল ধুয়ে দিতাম।” ৮৩

## হরাম না হলে স্ত্রীদের অনুরোধ ম্যানার চেষ্টা করতেন

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. হজ্বের সময় আয়িশার রাযি. মাসিক হওয়ার ঘটনা এবং এতে তার কান্নায় ভেঙে পড়ার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, “আল্লাহর রাসূল ﷺ মানুষের সাথে ব্যবহারে অনেক সহজ-সরল ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী কোনো কিছু করতে চাইলে তিনি তাতে অনুমতি দিতেন।” ৮৪

আরেক ঘটনা সম্পর্কে আয়িশা রাযি. বলেন, “একদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার সঙ্গে বসেছিলেন, এমন সময় বেশ কিছু উচ্চকণ্ঠে আওয়াজ শুনতে পেয়ে দেখতে

[৭৮] স্বামীর উপর স্ত্রীর নির্দিষ্ট অধিকার আছে, ঠিক যেমন স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার রয়েছে।

[৭৯] তাফসীর ইবন জারীর আত-তাবারি (৫৩২/৪)।

[৮০] বুখারী (৫৯২৪) ও মুসলিম (২১৫৬)।

[৮১] তার ঘরের জানালা মসজিদের অনেক কাছাকাছি ছিল, তাই তিনি ﷺ জানালা দিয়ে মাথা ভেতরে হেলে দিতে পারতেন।

[৮২] বুখারী (২০২৯) ও মুসলিম (২৯৭)।

[৮৩] বুখারী (৩০১) ও মুসলিম (২৯৭)।

[৮৪] মুসলিম (১২১৩)।



গেলেন, কী হচ্ছে। তিনি দেখলেন, কিছু আবেসিনীয় বালক বল্লম নিয়ে খেলা করছে। তিনি আমাকে বলেন, “আয়িশা, তুমি আসবে তাদের খেলা দেখতে?” আমি উঠে গিয়ে তার কাঁধে খুতনি রেখে খেলা দেখতে লাগলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার (দেখা) শেষ হলো?’ তাঁর কাছে আমার অবস্থান দেখার জন্য (কতক্ষণ এভাবে থাকেন) প্রত্যেকবার আমি ‘না’ বলতে লাগলাম।” ৮৫

ইবনে বাত্তাল রাহ. বলেন, “নবীজি কতটা মহান চরিত্রের ছিলেন, তা এ ঘটনা প্রমাণ করে এবং প্রত্যেকের উচিত হারাম না হলে স্ত্রীর খুশিকে নিজের জন্য কষ্টকর হলেও প্রাধান্য দেওয়া।” ৮৬

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, “আমি তাদের খেলা দেখছিলাম এবং আমিই শেষে খেলা দেখা বন্ধ করে সরে এলাম।” ৮৭

## জায়েজ কবিতা শোনার ব্যাপারে স্ত্রীদের নিষেধ করেননি

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ (আমার ঘরে) এসে দেখলেন, দুই বালিকা বুয়াসের যুদ্ধে আনসারদের দুই গোত্রের (আউস ও খায়রাজ) কবিতা আবৃত্তি করছে। তিনি বিছানায় অন্যদিকে মুখ ঘুরে শুয়ে পড়লেন। তারপর আবু বাকর এসে আমাকে বকা দিতে লাগলেন, “রাসূলুল্লাহর ঘরে শয়তানের যন্ত্র (কবিতা)! আল্লাহর রাসূল তার দিকে ফিরে বললেন, “ওদের ছেড়ে দাও।” এরপর তিনি আমাদের থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিলেন। আমি তাদেরকে ইশারায় চলে যেতে বললাম। আর এটা ঘটেছিল ঈদের দিনে।” ৮৮

ইবনে হাজর রাহ. বলেন, “এই রেওয়ায়েত প্রমাণ করে যে, ঈদের দিনে পরিবারের আনন্দের ব্যবস্থা করা (নিষিদ্ধ নয় এমন কিছু দিয়ে) এবং (রমাদানের সিয়াম ও দীর্ঘ রজ্বীর কিয়ামের) ইবাদাতের পর আরাম করা উত্তম। এ থেকে এটিও শেখা

[৮৫] তিরমিযী (৩৬৯১)। মূল হাদিস বুখারী (৪৫৫) ও মুসলিম (৮৯২)।

[৮৬] ইবনে বাত্তালের বুখারীর ব্যাখ্যা (৫৪৮/২)।

[৮৭] মুসলিম (৮৯২)।

[৮৮] বুখারী (৯৫০) ও মুসলিম (৮৯২)।

যায়, স্ত্রীদের ব্যাপারে নরম থাকা এবং তার ভালোবাসা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত।” ৮৯

ইবনে রজব রাহ. আরও বলেন, “রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদ ও বিয়ে উপলক্ষ্যে তাঁর স্ত্রীদের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার না করে কবিতা আবৃত্তি করে আনন্দ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তবে দফ নামক বাদ্যযন্ত্রে ছাড় রয়েছে।” ৯০

## অম্লবয়সী মেয়েদের সাথে আয়িশাকে রাখি. খেলার অনুমতি দিয়েছিলেন

আয়িশা রাখি. থেকে বর্ণিত, “আমি নবীজি ﷺ উপস্থিতিতে পুতুল খেলতাম এবং অনেক সময় আমার বান্ধবীরাও আমার সাথে খেলত। আল্লাহর রাসূল ﷺ (আমার ঘরে) ঢুকলে তারা লুকিয়ে পড়ত। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদেরকে আমার সাথে খেলা করার জন্য ডাক দিতেন।” ৯১

আয়িশা রাখি. থেকে বর্ণিত, “তাবুক বা খাইবার (রাবী এ-ব্যাপারে অনিশ্চিত) অভিযানের পর আল্লাহর রাসূল ﷺ বাসায় পৌঁছিলেন। এমন সময় গুদামঘরের পর্দা বাতাসে সরে গেল এবং আমার কিছু খেলনা দেখা গেল। নবীজি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, “এগুলো কী?” আমি জবাব দিলাম, ‘আমার পুতলা।’ সেগুলোর মধ্যে নবীজি ﷺ একটি কাপড়ের তৈরি ডানাওয়ালা ঘোড়া দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘এটি আমি কী দেখছি?’ বললাম, ‘ঘোড়া।’ তিনি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, ‘এটির ওপর এগুলো কী?’ বললাম, ‘ডানা।’ তিনি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, ‘দুই ডানাওয়ালা ঘোড়া?’ আমি বললাম, ‘আপনি শোনেননি সুলায়মানের (আলাইহিস সালাম) ঘোড়ারও ডানা ছিল?’

[৮৯] ফাতহুল বারী (৪৪৩/২)।

[৯০] দফের আওয়াজ স্পষ্ট ও চিকন নয় এবং সুরেলা ও আনন্দদায়কও নয়। ফলে দফ বলে পরিচিত কোন যন্ত্রের আওয়াজ যদি চিকন ও আকর্ষণীয় হয় তখন তা আর দফ থাকবে না; বাদ্যযন্ত্রে পরিণত হবে। - আওনুল বারী ২/৩৫৭  
আর দফের মধ্যে যদি বাদ্যযন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এসে পড়ে তবে সেটি আর জায়িজ থাকবে না, সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়িজ বলে পরিগণিত হবে। - মিরকাত ৬/২১০

অর্থাৎ দফ বলে পরিচয় দেয়া কোন যন্ত্রে বাদ্যযন্ত্রের কোন ধরনের বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেলেই একে আর দফ বলা যাবে না। তাই কেউ যেকোন যন্ত্রকে দফ বলে পরিচয় দিয়ে বাদ্যকে হালাল করার অপচেষ্টা করলে তা শরীয়ত বহির্ভূত কাজ বলেই গণ্য হবে এবং সুস্পষ্ট হারাম হবে। তবে প্রকৃত দফ হল ভিন্ন কথা। আল্লাহ শয়তানের যাবতীয় সূক্ষ্ম ধোকা থেকে আমাদের হিফাজত করুক। - সম্পাদক

[৯১] বুখারী (৬১৩০) ও মুসলিম (২৪৪০)।



আল্লাহর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আনন্দ, খেলাধুলা, মজা করা তাদের সম্পর্কে সৌহার্দ্য আর ভালোবাসার জোয়ার আনে। এতে বৈবাহিক বন্ধন দৃঢ় হয় এবং তাদের মধ্যে একে অপরের জন্য গভীর মমতা কাজ করে।

কাসিমী রাহ. বলেন, “কৌতুক আর মজা করলে নারীরা অনেক আমোদিত হয়।”<sup>৯২</sup>

দাইনুরী রাহ. বলেন, “উমার কত দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন! তিনিও পর্যন্ত বলেছেন, ‘স্ত্রীর সাথে শিশুর মতো (কৌতুকপূর্ণ) আচরণ করো; আর যখন তার প্রয়োজন দেখা দেবে, তখন সত্যিকার পুরুষের মতো এগিয়ে আসো।’”<sup>৯৩</sup>

অনেকে বন্ধুদের সাথে ঠিকই হাসি-তামাশা করে, কিন্তু বাসায় ঢুকতেই তাদের হাসি অদৃশ্য হয়ে যায়, বরং ভ্রু-কুঁচকে ঘরে চলাফেরা করে। এটি অবশ্যই নবীজির ﷺ সুনাতের পরিপন্থী কাজ।

## স্ত্রীর সঙ্গে নবীজি ﷺ দৌড়-প্রতিযোগিতা করতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে এক সফরে ছিলাম। তখনো আমার শরীরে ভারত্ব আসেনি। নবীজি ﷺ অন্যদের বললেন, ‘এগিয়ে যাও’, তারা তা-ই করল। তারপর তিনি ﷺ আমাকে বলেন, ‘আসো, দৌড়-প্রতিযোগিতা করি।’ দৌড়ে আমি তাঁকে হারিয়ে দিলাম। বেশ কিছু সময় পরের কথা। আমার শরীরে মাংস লেগেছে অর্থাৎ শারীরিক ভারত্ব এসেছে, সেই দৌড়ের কথাও ভুলে গিয়েছি। একদিন তাঁর সাথে আবার সফরে ছিলাম। নবীজি ﷺ অন্যদের বললেন, ‘এগিয়ে যাও’, তারা তা-ই করল। তারপর তিনি ﷺ আমাকে বলেন, ‘আসো, দৌড়-প্রতিযোগিতা করি।’ এবার দৌড়ে তিনি আমাকে হারিয়ে দিলেন। তিনি ﷺ হাসতে হাসতে বললেন, ‘এটা সেটার বদলা।’”<sup>৯৪</sup>

চিন্তা করুন, সফরের গুরুদায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও নবীজি ﷺ স্ত্রীর জন্য সময় বের করে তার আনন্দের খোরাক জুগিয়েছেন। কিন্তু আজকাল অনেক মানুষই তাদের স্ত্রীদের সাথে এরকম আনন্দ করতে বিব্রত বোধ করে, এমনকি তারা খোলা মরুভূমিতে একা

[৯২] মাওইয়াত আল-মুমিনীন (পৃষ্ঠা ১৬৮)।

[৯৩] আল-মুজালাসাহ ওয়া জাওয়াহির আল-ইলম (৪৩০/৩)।

[৯৪] আহমদ (২৫৭৪৫), আবু দাউদ (২৫৭৮) ও ইবনে মাজাহ (১৯৭৯)।

থাকা সত্ত্বেও এরকম আনন্দে এগিয়ে আসে না।

## জফরে রাতেরবেলা জ্বীর জাথে গল্প করতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “নবীজি ﷺ কোনো যাত্রায় বের হওয়ার আগে স্ত্রীদের মাঝে লটারি করতেন। একবার লটারিতে আমার ও হাফসার নাম এল। আমরা দুজনে তাঁর সাথে বের হলাম। নবীজি ﷺ (উটের পিঠে) সারা দিন ভ্রমণে থাকতেন আর রাত হলে আমার সাথে হাটতেন আর গল্প করতেন। এক রাতে হাফসা আমাকে বলল, ‘তুমি কি আজ রাতে আমার উটে থাকবে আর আমাকে তোমার উটের উপর থাকতে দেবে? তা হলে তুমি দেখবে (যা সচরাচর তুমি দেখ না) এবং আমিও দেখতে পাব (যা সচরাচর আমি দেখি না)?’ আমি বললাম, ‘আচ্ছা।’ তাই আমি হাফসার উটে চড়লাম আর হাফসা আমার উটে চড়ল। আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার উটের কাছে গেলেন যেটিতে হাফসা ছিল। তিনি ওই উটের কাছে গিয়ে সালাম দিলেন এবং তার সাথে উঠে বসলেন। নামার আগ পর্যন্ত সে উটেই থাকলেন। যখন রাসূল ﷺ তার সাথে উটে বসলেন, আমি ঈর্ষা অনুভব করলাম। আমি ঘাসে পা রেখে বলতে লাগলাম, ‘আল্লাহ, কোনো বিছা বা সাপ আমাকে যেন কামড় দেয়! রাসূলের ﷺ ব্যাপারে আমি তো কিছুই বলতে পারব না, কারণ তিনি তো আপনার রাসূল।’” ৯৫

আয়িশা রাযি. চরম ঈর্ষা কারণে এই কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন, আর নারীরা ঈর্ষার কারণে যা বলে, তা উপেক্ষা করা যায়। ৯৬

আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ এক সফরে ছিলেন। তাঁর সাথে আনজাশা নামে এক হাবশি গোলাম ছিল, সে বেশ দ্রুত উট চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল (উটে মহিলারা ছিল)। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বলে উঠলেন, “আনজাশা, কাঁচপাত্রগুলো (নারীরা) আছে, আস্তে যাও!” ৯৭

[৯৫] বুখারী (৫২১১) ও মুসলিম (২৪৪৫)।

[৯৬] হিংসা ও ঈর্ষা এই দুটোর মধ্যে ঈর্ষা পার্থক্য রয়েছে। মানুষের মধ্যে হিংসার আবির্ভাব হয় কলুষিত প্রবৃত্তি থেকে। পক্ষান্তরে ঈর্ষা বলা হয় নেক কাজের আকাঙ্ক্ষাকে। নিজ স্বামীর কাছে অধিক ভালোবাসার উপযুক্ত হতে চাওয়াটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত নেককাজ এবং প্রশংসনীয়ও বটে। রাসূলের ﷺ স্ত্রীদের মধ্যে এই নেক কাজের চমৎকার প্রতিযোগিতা আমরা দেখতে পাই। যা নারীমনের মানবীয় প্রকৃতিরও বহিঃপ্রকাশ। তাই এসব ঘটনাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা এবং নেককাজের প্রতিযোগিতা করার উৎসাহ হিসেবে নেয়া উচিত। - সম্পাদক

[৯৭] বুখারী (২৩২৩) ও মুসলিম (৬১৬১)।



আলিমগণ বলেন, নবীজি ﷺ নারীদের কাঁচপাত্রের সাথে তুলনা করেছেন, কারণ, তারা সহজেই প্রভাবিত হয়, (সচরাচর) কষ্ট সহ্য করতে পারে না। তারা কাঁচের পাত্রের মতোই দুর্বল—অনেক ভঙ্গুর, বেশি চাপ সহ্য করতে পারে না, বরং সহজেই ভেঙে যায়।

নববী রাহ. বলেন, “ধীরে ধীরে উট চালাতে বলার কারণ হলো, দ্রুতগতি উটের বাহক মহিলাদের ক্লান্ত করে তুলবে। এতে করে তারা পড়ে গিয়ে আঘাত পেতে পারে। এ-কারণে তিনি ﷺ তাকে আস্তে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।” ৯৮

## স্ত্রীদের একসাথে মজা করতে দেখে হৃদয়ভেদ

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “সাওদা বিনতে যামআ (নবীজির ﷺ স্ত্রী) একদিন আমাদের ঘরে আসলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার ও তার মাঝে বসে এক পা আমার কোলে আর অপর পা তার কোলের ওপর রাখলেন। আমি সাওদার জন্য হারিনা (মসুর, ছোলা এবং ধনে দিয়ে বানানো একধরনের স্যুপ) রান্না করেছিলাম। আমি তাকে বললাম, ‘খান।’ কিন্তু তিনি খেতে চাইলেন না। তখন আমি বললাম, ‘আল্লাহর কসম, আপনি খাবেন, নাহলে আমি আপনার মুখে ঢেলে দেব।’ এরপরও তিনি খেতে চাইলেন না। আমি তখন তার মুখে এর কিছুটা ঢেলে দিলাম। আল্লাহর রাসূল ﷺ হাসতে শুরু করলেন এবং উরু দিয়ে সাওদাকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে করতে তাকে বললেন, ‘ওর মুখেও ঢেলে দাও।’ তিনি তা-ই করলেন। তিনি ﷺ আবার হাসতে শুরু করলেন। হঠাৎ আমরা (বাইরে) উমারকে রাযি. বলতে শুনলাম, আবদুল্লাহ ইবনে উমার! আবদুল্লাহ ইবনে উমার!’ আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন আমাদের বললেন, ‘ওঠো, ওঠো! তোমাদের মুখ পরিষ্কার করো। আমার মনে হয়, উমার এখন আসবে।’” ৯৯

এই রেওয়ায়েত স্ত্রীদের সাথে নবীজির ﷺ আনন্দঘন মুহূর্তের এক অনুপম বর্ণনা। স্ত্রীদের মাঝে আয়িশাকে রাযি. তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসলেও অন্যদের সাথে তিনি কখনো অবিচার করেননি। তিনি ﷺ আয়িশার রাযি. পক্ষ নিয়ে অন্য স্ত্রীর সাথে অন্যায় করেননি, বরং অপরজনকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি ﷺ অত্যন্ত সফলভাবে

[৯৮] মুসলিম গ্রন্থের (৮১/১৫) ব্যাখ্যায় নববী (রাহ.)।

[৯৯] সুনান আল-কুবরা গ্রন্থে নাসাঈ (৮৯১৭) এবং ফাওয়াইদ গ্রন্থে আবু বকর আশ-শাফীঈ (১১২)।

পারিবারিক বন্ধনকে আনন্দঘন করে তুলতেন।

## স্ত্রীর ধাঁধা শুভতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “আমি রাসূলুল্লাহকে ﷺ বললাম, ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ, ধরুন, আপনি একটি উপত্যকায় এসে দেখলেন একটি গাছের কিছু পাতা খাওয়া হয়েছে, আর অন্য গাছগুলোর পাতা খাওয়া হয়নি। কোন গাছ থেকে আপনার উটকে খাওয়াবেন?’ তিনি ﷺ বললেন, ‘যে গাছ থেকে কোনো পাতা খাওয়া হয়নি।’” (এখানে আয়িশা রাযি. বোঝাতে চেয়েছেন, তাকে ছাড়া আর কাউকে তিনি ﷺ কুমারী হিসেবে বিয়ে করেননি।) <sup>১০০</sup>

## উপগত্য

নবীজির ﷺ পারিবারিক জীবন ছিল পুরোপুরি ইসলামী নীতির ছাঁচে গড়া। তিনি ইসলামকে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন, অন্যদের জন্যও ইসলাম মানার দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। তাঁর বৈবাহিক জীবনের অগণিত ঘটনা মুসলিমদের জন্য আদর্শ। খাদিজার রাযি. সাথে তাঁর পারিবারিক জীবন যেমন আমাদের এক-স্ত্রী পরিবার সম্পর্কে ধারণা দেয়, তেমনি পরবর্তীতে তাঁর একাধিক স্ত্রীর সাথে পারিবারিক জীবন আমাদের ধারণা দেয় প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন সত্তা হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে তিনি প্রত্যেকের উপযোগী আচরণ করতেন; স্ত্রীদের আনুগত্য ও ভালোবাসার বিনিময়ে তিনি ﷺ তাদের অধিকারকে সর্বোত্তম উপায়ে রক্ষা করতেন। একইভাবে নবীজির ﷺ স্ত্রীগণও স্বামী হিসেবে তাঁর অধিকার রক্ষায় তৎপর ছিলেন। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি আনার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করে। এর সর্বোত্তম উদাহরণ নবীজির ﷺ জীবন। এজন্যই তিনি ﷺ বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে সেরা তারাই, যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে আচরণে সেরা।” <sup>১০১</sup>

অপর এক হাদীসে তিনি ﷺ বলেন, “কোনো ঈমানদার পুরুষ যেন ঈমানদার

[১০০] বুখারী (৫০৭৭)।

[১০১] তিরমিযী (১০৮২)।



নারীকে (তার স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে। তার কোনো বৈশিষ্ট্য তার অপছন্দনীয় হবে, আবার তার এমন গুণও আছে, যাতে সে সন্তুষ্ট হবে।” ১০২

নবীজি ﷺ আরও বলেন, “নারীদের ব্যাপারে আমার পরামর্শ মাথায় রেখে—নারীর সাথে দয়াদ্রু আচরণ করো।” ১০৩

---

[১০২] মুসলিম (২৬৭২)।

[১০৩] বুখারী (৩৩৩১) ও মুসলিম (১৪৬৮)।

## দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

যেভাবে অন্য নারীদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হিজেবে তাঁর  
স্ত্রীদের গড়ে তুলেছেন

স্ত্রীদের সাথে কৌতুক আর হাসি-তামাশা যেমন আল্লাহর রাসূল ﷺ করতেন, তেমনি উম্মাহর নারীদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে গড়ে তোলায় তাদের প্রশিক্ষণও দিয়েছেন। এ-ব্যাপারে তিনি ﷺ বলেন, “আল্লাহ প্রত্যেককে তার অধীনস্থ মানুষের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন, সে কি তাদের ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করেছে, নাকি ধ্বংস করেছে! এভাবে তিনি মানুষকে তার পরিবারের দায়িত্ব সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করবেন।” ১০৪

ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন, “তোমরা প্রত্যেকেই অভিভাবক, তাই নিজ নিজ অধীনস্থদের ব্যাপারে তোমরা দায়বদ্ধ থাকবে। একজন শাসক একজন অভিভাবক, সে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে দায়বদ্ধ। একজন পুরুষও একজন অভিভাবক, সে তার পরিবারের ব্যাপারে দায়বদ্ধ।” ১০৫

একজন স্বামীর দায়িত্ব তার স্ত্রীকে শিক্ষিত করা, দিকনির্দেশনা দেওয়া। ইসলাম ও জীবন সম্পর্কে স্বামী শিক্ষা না দেওয়ার কারণে অনেক নারীর জীবনে অশুভ পরিণতি দেখা দিয়েছে। হয়তো যথার্থ শিক্ষা ও পথনির্দেশ পেলে তারা এ-দুনিয়া ও আখিরাত—দুই জগতেই উপকৃত হতে পারত।

[১০৪] নাসাঈ (৯১৭৪)।

[১০৫] বুখারী (৮৯৩) ও মুসলিম (১৮২৯)।



## স্ত্রীদের ইবাদাত সম্পর্কে শেখাতেন

উম্মে সালামা রাযি. (নবীজির স্ত্রী) থেকে বর্ণিত, “এক রাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ উঠে বললেন, ‘সুবহানাল্লাহ! আজ রাতে আল্লাহ কত দুঃখ-কষ্ট নাযিল করেছেন, আবার এই রাতেই আল্লাহ কত গুণ্ডধন নাযিল করেছেন। কে আছে, এখানকার নারীদের (তাঁর স্ত্রীদের) সালাতের জন্য জাগিয়ে তোলা! এ জগতের সুসজ্জিত ব্যক্তিও দেখা যাবে আখিরাতে উলঙ্গ হয়ে উঠবে।” ১০৬

আখিরাতে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারে মানুষের উদাসীনতা রাসূলুল্লাহকে ﷺ পেরেশান করে তুলত। তিনি তাঁর স্ত্রীদের এ-সম্পর্কে সজাগ করতে শেষ রাতে জেগে উঠাতেন। তিনি তাদের ইবাদাত করতে তাগাদা দিতেন, তারা কেবল তাঁর ﷺ স্ত্রী বলে আখিরাতে পার পেয়ে যাবে, এমনটা যেন ভেবে না বসে। তাই প্রত্যেকের উচিত নিজের স্ত্রীকে শেষরাতে জেগে তুলে একসাথে ইবাদাত করা, বিশেষ আবহাওয়াগত বিশেষ ঘটনার সময় (ঝড়ো বাতাস, হারিকেন, টর্নেডো, চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ ইত্যাদির সময়) ইবাদাতে তাগাদা দেওয়া।

## মন্দের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করতে তাদের শেখাতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “(এক রাতে) আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার হাত ধরলেন এবং চাঁদের দিকে দেখিয়ে বললেন, আয়িশা, এটি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও, কারণ, এর সম্পর্কেই আল্লাহ বলেছেন, ‘অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই, যখন তা বিস্তার লাভ করে।’” (আল কুরআন, ১১৩: ৩) ১০৭

ইবনে কাসীর রাহ. বলেন, “তিনি ﷺ রাতের অন্ধকার থেকে আশ্রয় চাইতে বলার কারণ হলো মন্দ সাধারণত রাতে ছড়িয়ে পড়ে। অন্য আরেক হাদীসেও সরাসরি চাঁদের কথা বলা আছে, যা এ-আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়; কারণ, রাত চেনা যায়

[১০৬] বুখারী (৭০৬৯)।

[১০৭] তিরমিযী (৩২৮৮)।

চাঁদের দ্বারা এবং এটা কেবল রাতেই দেখা যায়।” ১০৮

এই রেওয়ায়েতে দেখা যায়, স্ত্রীকে শেখানোর ব্যাপারে তিনি ﷺ এতটা আন্তরিক ছিলেন যে, হাত ধরে তাকে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি শুধু নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, একই সাথে কারণও ব্যাখ্যা করে তাকে বুঝিয়ে দিতেন।

## তাদের উপকারী দুআ শেখাতেন

জুওয়ায়রিয়া রাযি. (নবীজির স্ত্রী) থেকে বর্ণিত, “আমি ফজরের সালাত পড়ছিলাম। এ-সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। পরে সকাল হলে তিনি ﷺ ফিরে এলেন। আমি তখনো সেখানেই (সালাতের জায়গায়) বসেছিলাম। নবীজি ﷺ আমাকে বললেন, ‘আমি চলে যাওয়ার পর থেকে তুমি সেই একই জায়গায় বসে আছ (এতক্ষণ)?’ আমি বললাম, ‘হ্যাঁ।’ তখন নবীজি ﷺ বললেন, ‘তোমার কাছ থেকে চলে যাবার পর আমি মাত্র চারটি শব্দ তিনবার পড়েছি এবং সেগুলো ওজন করলে তুমি এতক্ষণ যা পড়েছ, তার থেকে ভারী হবে; (সেগুলো হলো)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِينَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর সৃষ্টিকুলের সংখ্যার পরিমাণ, তিনি সন্তুষ্ট হওয়া পরিমাণ, তার আরশের ওজনের সমপরিমাণ, তার কথা লিপিবদ্ধ করার কালি পরিমাণ।” ১০৯

আস-সিন্দি রাহ. বলেন, “এর মানে হলো, এমন দুআ আছে, যেগুলো অপর দুআ থেকে উত্তম; কারণ, সেগুলো আরও ব্যাপক এবং আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সম্বলিত। এ-কারণে তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অন্য লম্বা দুআগুলোর চেয়ে সেগুলোর সাওয়াব অনেক বেশি।” ১১০

[১০৮] তাফসীর ইবনে কাসীর (৫৩৬/৮)।

[১০৯] মুসলিম (২৭২৬)।

[১১০] আস-সুয়ূতী এবং আস-সিন্দি কর্তৃক নাসাঈ গ্রন্থের ব্যাখ্যা (৭৮/৩)।



## রাসূল ﷺ তাদের সহজ কিন্তু সর্বোত্তম ইবাদাতগুলো শেখাতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “আমি কাবার ভেতরে প্রবেশ করে সালাত পড়তে পছন্দ করতাম। একবার নবীজি ﷺ আমার হাত ধরে আমাকে হিজরের (কাবার অর্ধবৃত্তাকার দেয়াল) ভেতরে নিয়ে গিয়ে বললেন, ‘কাবার ভেতর সালাত পড়তে চাইলে হিজরের ভেতর সালাত পড়ো—এটি কাবারই অংশ।’” ১১১ এভাবে তিনি ﷺ তাকে কাবার ভেতরে সালাত পড়ার একটি সহজ উপায় শিখিয়ে দিলেন।

## ইবাদাতে নিজের ওপর অত্যাচার করতে নিষেধ করতেন

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করে দুই খুঁটির মাঝে একটি দড়ি বাঁধা পেলেন। তিনি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, ‘এটা কী?’ লোকেরা উত্তর দিল, ‘এটা যায়নাবের জন্য। তিনি সালাত পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে গেলে এটা ধরে থাকেন।’ তিনি ﷺ বললেন, ‘এটা খুলে ফেলো। যতক্ষণ শরীর সতেজ থাকে, সালাত পড়ো; এরপর ক্লান্ত হয়ে গেলে থেমে যাও।’” ১১২

নববী রাহ. বলেন, “এই রেওয়াজে থেকে প্রমাণিত যে, ইবাদাতের ব্যাপারে নিজের ওপর কেউ যেন কঠোর না হয়, বরং ভারসাম্য বজায় রাখে। শরীরে উদ্যম থাকা পর্যন্ত ইবাদাত করতে থাকবে এবং ক্লান্ত হয়ে গেলে বন্ধ করে দিয়ে (আরাম করে) আবার শক্তি সঞ্চয় করবে।” ১১৩

আয়িশা রাযি. নবীজিকে ﷺ এক মহিলা সম্পর্কে বললেন, যে না ঘুমিয়ে সারা রাত সালাত পড়ে। তিনি ﷺ এরকম করতে নিষেধ করলেন। উরওয়া ইবনে আয-যুবাইর রাযি. থেকে বর্ণিত, “আয়িশা রাযি. আমাকে বলেছেন, একবার হাওলা বিনতে তুওয়াত (একজন মহিলা সাহাবী) তার ও নবীজির ﷺ পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। আয়িশা রাযি. বললেন, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ, লোকে বলে হাওলা বিনতে তুওয়াত রাতে ঘুমায় না।’ তিনি ﷺ বলে উঠলেন, ‘রাতে ঘুমায় না! এমন কাজই করো, যা করার সামর্থ্য তোমাদের আছে।’

[১১১] আবু দাউদ (৮০২) ও নাসাঈ (২৯১২)।

[১১২] বুখারী (১১৫০) ও মুসলিম (৭৮৪)।

[১১৩] মুসলিম গ্রন্থের (৭৩/৬) ব্যাখ্যায় নববী (রাহ.)।

তোমরা ক্লান্ত হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহ ক্লান্ত হবেন না।” ১১৪

নবী রাহ. বলেন, “‘রাতে ঘুমায় না!’—কথার দ্বারা তিনি ﷺ এ-কাজের ব্যাপারে অসম্মতি জানিয়েছেন এবং সে যে তার নিজের ওপর কঠোর, তা বুঝিয়েছেন।” ১১৫

## পরিমাণে অল্প হলেও ইবাদাত নিয়মিত জারি রাখতে উৎসাহ দিতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন, “আল্লাহর কাছে সেই আমলগুলো প্রিয় যেগুলো নিয়মিত, যদিও তা পরিমাণে অল্প হোক না কেন।” কাসিম ইবনে মুহাম্মদ রাহ. বলেন, “আয়িশা রাযি. কোনো ইবাদাত শুরু করলে, সেটি কখনোই ছেড়ে দিতেন না।” ১১৬

ইবনে আল-জাওয়ী রাহ. বলেন, “মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ দুটি কারণে নিয়মিত আমল পছন্দ করেন; প্রথমত, কোনো আমল শুরু করে সেটি থামিয়ে দেওয়া সেই আমল ছেড়ে দেওয়ার সমতুল্য। দ্বিতীয়ত, কোনো আমল নিয়মিত করা কোনো দাসের তার প্রভুর নিয়মিত সেবা করার সমতুল্য। সে এমন এক খাদেম, যে তার প্রভুর দরজার সামনে প্রতিদিন কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকে; তার মতো না, যে সারা দিন প্রভুর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে এবং সে-স্থান ত্যাগ করে চিরতরে চলে যায়।” ১১৭

## বেশি বেশি দান করতে উৎসাহ দিতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, “আয়িশা, নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো, একটি খেজুরের অর্ধেক দান করে হলেও।” ১১৮

“অর্ধেক খেজুর” দ্বারা কোনো কিছু সামান্য থেকে সামান্যতম হলেও সেটি দান

[১১৪] বুখারী (৪৩) ও মুসলিম (৭৮৫)।

[১১৫] মুসলিম গ্রন্থের (৭৩/৬) ব্যাখ্যায় নবী (রাহ.)।

[১১৬] বুখারী (৬৪৬৫) ও মুসলিম (৭৮৩)।

[১১৭] ফাতহুল বারী (১০৩/১)।

[১১৮] আহমদ (২৩৯৮০)।



করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য আয়িশাকে রাযি. আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ ইবাদাত করতেও উৎসাহিত করেছেন।

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার সঙ্গে ছিলেন; এমন সময় এক ভিক্ষুক এলে তাকে আমি (আমার খাদেমকে) কিছু দান করতে বললাম। তবে দেওয়ার আগে সে কী দিচ্ছে, তা আমাকে দেখাতে বললাম (তা হলে বুঝতে পারব, আমার কাছে কতখানি অবশিষ্ট থাকছে)। আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, ‘আয়িশা, তোমার বাসায় কী ঘটছে, তার সব কিছু তদারকি করতে তুমি আগ্রহী? (দানে ব্যবহৃত হয় এরকম) সব কিছুই তোমার গোচরে থাকুক, এটিই তোমার ইচ্ছা?’ আমি বললাম, ‘হ্যাঁ।’ তিনি ﷺ বললেন, ‘আয়িশা, (দানের জন্য) ব্যয় করো এবং জমা করে রেখো না। না হলে আল্লাহ তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন।’” <sup>১১৯</sup>

ইবনে হাজার রাহ. বলেন, “আল্লাহর রাসূল ﷺ এই রেওয়ায়েতে নির্দেশ দিয়েছেন যে, সম্পদ কমে যাবে, এই ভয়ে যেন দান করতে আমরা বাধা না দিই। কারণ, দান থেকে বিরত থাকা সম্পদ কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ। এই দানের কারণেই আল্লাহ দানকারীকে অফুরন্ত রিয়ক দিয়ে থাকেন। যে সম্পদ হিসাব না করেই দান করে, তাকে আল্লাহ এমন জায়গা থেকে (রিয়ক) দেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না।” <sup>১২০</sup>

আরেকবার ভেড়া কুরবানির সময় নবীজি ﷺ তাঁর স্ত্রীদের উদার-হাতে দান করার শিক্ষা দিয়েছিলেন। আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “একবার আমরা একটি ভেড়া জবাই করলাম (এবং সেখান দান করলাম)। পরে আল্লাহর রাসূল ﷺ এসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কতখানি বাকি আছে?’ আমি বললাম, ‘কাঁধের মাংস ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।’ তিনি ﷺ বললেন, ‘বরং বলো, কাঁধের মাংস ছাড়া বাকি সবটুকুই আছে।’” <sup>১২১</sup>

মুবারাকপুরী রাহ. বলেন, “এর দ্বারা তিনি ﷺ বুঝিয়েছেন আমরা যা দান করব, সেগুলো আমাদের জন্য থেকে যাবে (পুরস্কার হিসেবে) আর যা নিজের জন্য রেখে দেওয়া হলো, তা তো চলে গেল (সেগুলোর কোনো প্রতিদান পাওয়া যাবে না)।” <sup>১২২</sup> এখানে তিনি ﷺ আল্লাহর এই কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন,

[১১৯] আবু দাউদ (১৭০০) ও নাসাঈ (২৫৪৯)।

[১২০] ফাতহুল বারী (৩০০/৩)।

[১২১] তিরমিযী (২৩৯৪)।

[১২২] তুহফাতুল আওয়াযী (১৪২/৭)।

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ  
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“তোমাদের যা আছে ধ্বংস হয়ে যাবে, আল্লাহর কাছে যা আছে, তা চিরকাল রয়ে যাবে।  
আমি নিশ্চয়ই যারা ধৈর্য ধরে থাকত, তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কাজের অনুপাতে  
পুরস্কার দেব।” ১২৩

যারা দান করবে তারা জান্নাতে তাঁর সাথে সবার আগে মিলিত  
হবে

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “তোমাদের মাঝে সবার আগে  
আমার সাথে (জান্নাতে) তার দেখা হবে, যার লম্বা হাত রয়েছে (অর্থাৎ যিনি অনেক  
বেশি দান করেন)।” আয়িশা রাযি. বলেন, “তখন আমরা আমাদের হাত বাড়িয়ে দিয়ে  
মাপতে গিয়ে দেখলাম, সব থেকে লম্বা হাত সাওদার; কিন্তু (হাদীসের মতে) লম্বা হাত  
ছিল যায়নাবের; কারণ, সে নিজ হাতে জিনিস তৈরি করত (ও বিক্রি করত) এবং সে-  
অর্থ দান করত।” ১২৪

নববী রাহ. বলেন, “শুরুতে তারা ভেবছিলেন যে, নবীজি ﷺ আক্ষরিক অর্থে  
হাতের দৈর্ঘ্যের কথা বলেছেন; তাই তারা হাতের দৈর্ঘ্য মাপতে গিয়ে দেখলেন, সাওদার  
হাত দৈর্ঘ্যে লম্বা। অন্যদিকে যায়নাব ছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে উদার দানশীল; এবং  
তিনি মারা গেলে (তিনি নবীজির ﷺ পর প্রথম মারা যান) তারা বুঝতে পারলেন, এটি  
একটি রূপক ছিল। এর দ্বারা নবীজি ﷺ দান করার কথা বুঝিয়েছেন।” ১২৫

ইবনে হাজার রাহ. বলেন, “এই রেওয়ায়েত দ্বারা বোঝা যায়, আমাদের উচিত  
যত সম্ভব বেশি বেশি দান করা; তা হলে আমরা নবীজির ﷺ সাথে জান্নাতে দেখা করতে  
পারব।” ১২৬

[১২৩] আন-নাহল : ৯৬

[১২৪] বুখারী (১৪২০) ও মুসলিম (২৪৫২)।

[১২৫] মুসলিম গ্রন্থের (৮/১৬) ব্যাখ্যায় নববী (রাহ.)।

[১২৬] ফাতহুল বারী (২৮৬/৩)।



## সচ্চরিত্র শেখাতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পর আফলাহ আমার সাথে দেখা করতে এল। তিনি আবুল কুয়াসের ভাই—যার স্ত্রী আমাকে বুকের দুধ খাইয়েছিলেন। আফলাহ (প্রবেশ করার) অনুমতি চাইলে আমি তাকে বললাম, ‘আল্লাহর কসম, আমি রাসূলের ﷺ নির্দেশ না পেয়ে আফলাহকে ঘরে ঢোকার অনুমতি দিতে পারি না। কারণ, আবুল কুয়াস আমাকে দুধ পান করায়নি, বরং তার স্ত্রী আমাকে দুধপান করিয়েছিল।’ পরে আল্লাহর রাসূল ﷺ ঘরে এলেন। আমি তাকে বললাম, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ, আফলাহ আবুল কুয়াসের ভাই। সে (আমার ঘরে) ঢোকার অনুমতি চেয়েছিল। আমি আপনার নির্দেশ ছাড়া তাকে ঘরে ঢোকানো পছন্দ করলাম না। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, ‘তাকে অনুমতি দিতে কীসে তোমাকে বাধা দিল?’ আমি বললাম, ‘আবুল কুয়াস আমাকে দুধ পান করায়নি, বরং তার স্ত্রী আমাকে দুধপান করিয়েছিল।’ এটি শুনে তিনি ﷺ বললেন, ‘তাকে (ঘরে ঢোকার) অনুমতি দিতে পারো, কারণ সে তোমার চাচা (দুধপিতার ভাই)।’ ১২৭

## জ্ঞান ছাড়াই কোনো বিষয়ে কথা বলতে নিষেধ করতেন

পর্যাপ্ত জ্ঞান ছাড়াই কোনো বিষয়ে কথা বলতে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদের নিষেধ করতেন, যেন তাড়াহুড়া করে তারা কোনো ভুল মতামত দিয়ে না বসে।

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “একবার আনসারদের এক বাচ্চার জানাজা সালাত পড়াতে রাসূলুল্লাহকে ﷺ অনুরোধ করা হলো। আমি বললাম, ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ, এ-শিশুর জন্য তো সুখবর, সে পাপ না করায় জান্নাতের পাখি হয়ে উড়ে বেড়াবে। সে বালেগ হওয়ার আগেই এমন এক বয়সে মারা গিয়েছে যে, পাপ করার সুযোগই পায়নি।’ তিনি ﷺ বললেন, আয়িশা, (কথা বলতে গিয়ে) তাড়াহুড়া করো না; বিপরীতও ঘটতে পারে। আল্লাহ যোগ্যদের জন্য জান্নাত সৃষ্টি করেছেন—তাদের পিতার কটিদেশ থেকে তাদের বের করারও বহু আগে। আল্লাহ জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন, যারা জাহান্নামে যাবে, তাদের জন্য। তিনি তাদের জন্য জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন—তাদের

[১২৭] বুখারী (৪৭৯৬) ও মুসলিম (১৪৪৫)।

পিতার কটিদেশ থেকে বের করারও বহু আগে।” ১২৮

নববী রাহ. বলেন, “মুসলিম আলিমদের সর্বসম্মত অভিমত হলো, কোনো মুসলিম শিশু যদি (বালেগ হওয়ার আগেই) মারা যায়, তবে সে জান্নাতে যাবে। কারণ, সে বালেগ হয়নি—যখন থেকে তার আমলের হিসাব নেওয়া শুরু হয়। আলিমগণ আরও বলেন, উপরোক্ত হাদীসে নবীজির ﷺ উদ্দেশ্য ছিল আয়িশাকে রাখি। শেখানো যে, পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে এবং প্রমাণ ছাড়া তিনি যেন তাড়াহুড়ো করে কোনো মতামত না দেন।” ১২৯

### তাকওয়া অর্জন ও ভালো ব্যবহার করতে বলতেন

আয়িশা রাখি. থেকে বর্ণিত, একবার নবীজি ﷺ তাকে বললেন, “আয়িশা, সব সময় আল্লাহর ব্যাপারে সচেতন থাকো এবং দয়ার আচরণ করো। কারণ, দয়া যখন কোনো কিছুতে যুক্ত হয়, তখন তা সেটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে; আর কোনো কিছুতে দয়া না থাকলে তা বিকৃত (ও ক্রটিপূর্ণ) হয়ে যায়।” ১৩০

‘আসিম আবাদী বলেন, “এখানে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে”—এর অর্থ হলো পূর্ণতা দেয়।” ১৩১

### জহ্নশীলতা, উদারতা ও ক্ষমা করতে শেখাতেন

আয়িশা রাখি. থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ তাকে বলেছেন, “আয়িশা, সব সময় মানুষকে দয়া করো। আল্লাহ যখন কোনো ঘরের মঙ্গল চান, তিনি তার মাঝে দয়ার প্রসার করে দেন।” ১৩২

[১২৮] মুসলিম (২৬৬২)।

[১২৯] মুসলিমের গ্রন্থের (২০৭/১৬) ব্যাখ্যায় নববী (রাহ.)।

[১৩০] আহমদ (২৩৭৮৬) । এ হাদীসের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মুসলিম (২৫৯৪) হয়েছে।

[১৩১] ‘আওন আল-মাবুদ (১১৩/১৩)।

[১৩২] আহমাদ (২৩৯০৬)।



ভালো কথা বলতে উৎসাহ দিতেন এবং অজার কথাবার্তা থেকে  
দূরে থাকার নির্দেশ দিতেন।

আয়িশা রাযি. বর্ণিত, “কিছু ইহুদী নবীজির ﷺ কাছে এসে বলল, ‘আস-সামু আলাইকুম’ (যার মানে হলো—তোমাদের মৃত্যু হোক)। নবীজি ﷺ বলেন, ‘ওয়া আলাইকুম’ (মানে তোমাদেরও অনুরূপ হোক)। আয়িশা রাযি. (তাদের) বলে উঠলেন, ‘তোমাদের মৃত্যু হোক, তোমাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ ও গজব পড়ুক!’ নবীজি ﷺ বললেন, ‘শান্ত হও, আয়িশা! তোমার আচরণ নরম করো। খারাপ আর রূঢ় কথা বলা থেকে সাবধান থাকো।’ তিনি নবীজিকে ﷺ বললেন, ‘তারা (ইহুদীরা) আপনাকে কী বলেছে শোনেননি?’ তিনি ﷺ বললেন, ‘তুমি শোনোনি আমি তাদের কী বলেছি? আমি তাদের কথাই তাদেরকে বলেছি। তাদের বিরুদ্ধে আমার দুআ কবুল করা হবে, কিন্তু আমার ব্যাপারে তাদের কথা কবুল করা হবে না।’” ১৩৩

### স্ত্রীদের আকীদা সম্পর্কে শেখাতেন

আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদের আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করার ব্যাপারে শেখাতেন। যখনই আকাশ মেঘে ছেয়ে যেত বা ঝড় উঠত, তখনই তিনি বারবার ঘরের ভেতরে-বাইরে যাওয়া আসা করতেন এবং তাঁর চেহারার রঙ বদলে যেত।

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “অন্ধকার মেঘ বা ঝড় দেখলেই নবীজির ﷺ চেহারায় ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠত। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ, মানুষ তো বৃষ্টি আসবে ভেবে কালো মেঘ দেখে খুশি হয়। কিন্তু আমি আপনার চেহারায় অনেক ভয় দেখতে পাচ্ছি।’ তিনি ﷺ বললেন, ‘আয়িশা, আমার ভয় হয় (মেঘে করে) আমাদের জন্য শাস্তি আসছে, যেভাবে (পূর্ববর্তী) জাতির জন্য শাস্তি আসত; আর তারা তা দেখে বলত, ‘এটি তো আমাদের জন্য বৃষ্টি নিয়ে এসেছে, এমন মেঘ!’” (আল কুরআন, ৪৬ : ২৪) ১৩৪

[১৩৩] বুখারী (২৯৩৫) ও মুসলিম (২১৬৫)।

[১৩৪] বুখারী (৪৮২৯) ও মুসলিম (৮৯৯)।

## মানুষের আকীদাঃক্রান্ত ভুলগুলো সম্পর্কে অন্তর্ক করতে

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “একবার নবীজি ﷺ অসুস্থ ছিলেন। (তাঁর সামনে) তাঁর স্ত্রীরা ইথিওপিয়ায়-দেখা মারিয়া নামের এক গির্জা নিয়ে গল্প করছিল। উম্মে সালামা ও উম্মে হাবীবা ইথিওপিয়ায় গিয়েছিলেন। তারা উভয়ে সেটির (গির্জা) সৌন্দর্য ও ছবিগুলোর প্রশংসা করছিলেন। নবীজি ﷺ তাঁর মাথা তুলে বললেন, “তারা তো সে-সব লোক, যাদের কোনো ধর্মপ্রাণ মানুষ মারা গেলে তার কবরকে ইবাদাতস্থল বানাত এবং সেগুলোতে ছবি আঁকাত। তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।” <sup>১৩৫</sup> অসুস্থতা সত্ত্বেও নবীজি ﷺ লোকগুলোর ভুলের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে নীরব থাকেননি, বরং তিনি তাঁর স্ত্রীদের এ সম্পর্কে বিস্তারিত বুঝিয়ে সাবধান করেছেন।

## তাঁর ঘরে কোনো পাপ না ঘটান ব্যাপারে অজাগ থাকতে

পরিবারের কর্তার একটি বড় দায়িত্ব হলো পরিবারকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষার চেষ্টা করা। আল্লাহ বলেন, “তোমরা যারা বিশ্বাস এনেছ (শোনো), নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করো, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।” (আল কুরআন, ৬৬ : ৬)

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “নবীজি ﷺ আমার ঘরে ঢুকে দেখলেন (পশুর) ছবি-সম্বলিত পর্দা ঝোলানো। তাঁর চেহারা রাগে লাল হয়ে গেল, তিনি সাথে সাথে পর্দা টেনে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে বললেন, “যারা এরকম চিত্রাঙ্কন করে, তারা কিয়ামতের দিন কঠিনতম শাস্তি পাবে।” <sup>১৩৬</sup>

## মন্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করতে

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “আমি এক ব্যক্তির সামনে তার অনুকরণ করছিলাম (মজা করার জন্য)। তিনি ﷺ বলেন, “আমি কখনোই কারও অনুকরণ করা পছন্দ করি

[১৩৫] বুখারী (৪২৭) ও মুসলিম (৫২৮)।

[১৩৬] বুখারী (৬১০৯)।



না, এজন্য আমাকে যা-ই দেওয়া হোক না কেন।” ১৩৭

আল-আসিম আবাদী রাহ. বলেন, “আমি কখনোই কারও অনুকরণ করা পছন্দ করি না” দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন, তিনি কারও কথা, কথা বলার ঢং বা কাজ অনুকরণ করত তাকে পরিহাস করে তিনি আনন্দ পান না। “এজন্য আমাকে যা-ই দেওয়া হোক না কেন” অর্থ তাকে এজন্য প্রচুর দুনিয়াবি সম্পদ দেওয়া হলেও (তিনি তা করবেন না)।” ১৩৮

মুবারাকপুরী রাহ. বলেন, “নববী রাহ. বলেন, অন্যদের অনুকরণ করা গিবতেরই একটি ধরন, যা করা নিষিদ্ধ।” ১৩৯

## ছোট ছোট পাপের ব্যাপারেও স্ত্রীদের সাবধান করতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “আয়িশা, সগীরা গুনাহের ব্যাপারে সাবধান থাকো। আল্লাহ সেগুলো লিখে রাখার জন্যও একজন ফেরেশতা নিয়োগ করে রেখেছেন।” ১৪০

আস-সিন্দি রাহ. বলেন, “সগীরা গুনাহ এমন পাপ, যেগুলো মানুষ অনেক তুচ্ছ ভাবে এবং সহজেই করে বসে। আল্লাহর নিকট সে-সব গুনাহ অনেক বড়, তাই সেগুলো লিখে রাখার জন্যও একজন ফেরেশতা নিয়োগ করে রেখেছেন।” ১৪১

## অম্পর্কিত ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে স্ত্রীকে উৎসাহ দিতেন

আবু মুলায়কাহ রাহ. থেকে বর্ণিত, আয়িশা রাযি. কোনো কিছু সম্পূর্ণ না বুঝলে সে-ব্যাপারে নবীজিকে ﷺ প্রশ্ন করতেন। একবার নবীজি ﷺ বলেন, “যার হিসাব নেওয়া হবে, সে শাস্তি পাবে।” এটি শুনে আয়িশা রাযি. জিজ্ঞেস করলেন,

[১৩৭] আবু দাউদ (৪৮৭৫) এবং তিরমিযী (২৫০২) কর্তৃক।

[১৩৮] ‘আওন আল-মা’বুদ (১৫১/১৩)।

[১৩৯] তুহফাতুল আওয়াযী (১৭৬/৭)।

[১৪০] ইবনে মাজাহ (৪২৪৩)।

[১৪১] ইবনে মাজাহর গ্রন্থের (৫৯/৮) ব্যাখ্যায় আস-সিন্দি (রাহ.)।

“আল্লাহ কি বলেননি ‘যার ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তার হিসাব সহজে নেওয়া হবে।’ (আল কুরআন, ৮৪ : ৮) তিনি ﷺ উত্তর দিলেন, ‘এটি তো আমলনামা দেওয়ার ব্যাপারে ব্যাখ্যা। কিন্তু যাকে প্রশ্ন করা হবে, আমলের ব্যাপারে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।’” ১৪২ ১৪৩

## স্ত্রীদের ব্যাপারে নবীজির ﷺ গাইরাহ কাজ করত

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “এক খোজা (মেয়েলি পুরুষ) রাসূলের ﷺ স্ত্রীদের সাথে দেখা করতে আসত। তারা তাকে নপুংসক বা জৈবিক ইচ্ছাহীন মানুষ হিসেবে মনে করত। একদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ ঘরে ঢুকে দেখলেন তাঁর এক স্ত্রীর কাছে সে এক মহিলার বিবরণ দিচ্ছে, যে অনেক সৌন্দর্যের অধিকারিণী ছিল। তার কথা শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, “এ-লোকটা কীভাবে নারীদের বর্ণনা দিতে হয়, জানে (অর্থাৎ পুরুষের মতো তারও কামনা আছে)। (এখন থেকে) সে তোমাদের বাসায় যেন ঢোকান অনুমতি না পায়।” ১৪৪

ইবনে হাজার রাহ. বলেন, “নবীজির ﷺ স্ত্রীগণ লোকটিকে খোজা ভেবে ঘরে ঢোকান অনুমতি দিত এবং তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তার নারীদের প্রতি কোনো আসক্তি নেই। কিন্তু নবীজি ﷺ তার কোনো এক নারীর বিবরণ দেওয়া দেখে বুঝতে পারলেন, তার নারীদের প্রতি কামনা থাকতে পারে। তিনি ﷺ আরও ভয় করেছিলেন যে, সে হয়তো তাঁর স্ত্রীদের বর্ণনাও অন্যদের কাছে করে বেড়াতে পারে। এই হাদীস তা-ই প্রমাণ যে, কোনো লোক যদি নারীকে দেখে তার সৌন্দর্যের বর্ণনা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে (মাহরাম হলেও) তার সামনে পর্দা করে যেতে হবে। এ থেকে আমরা এই

[১৪২] বুখারী (১০৩) ও মুসলিম (২৮৭৬)।

[১৪৩] আশা এবং ভয় একই পাখির দুটো ডানার মতো। নিজের ওপর বর্তানো শরীয়তের হুকুম আহকাম পালন করার সাথে সাথে বান্দার মধ্যে সর্বদা এই ধ্যান থাকা চাই, রব্বুল আলামীন তাউফিক দিয়েছেন বলেই তাঁর আনুগত্যের সৌভাগ্য হচ্ছে, তাই আশা করা যায় তিনি আপন দয়ায় আমলগুলো কবুল করবেন। আবার একইসাথে এই ভয়ও থাকা চাই যে, যতটা বিশুদ্ধতার সাথে আল্লাহর হুকুম আদায় করা দরকার; আমার দ্বারা সেটা হয়নি। তাই না জানি আল্লাহর দরবারে আমলগুলো বাতিল হয় কিনা। বাস্তবিকপক্ষেই আল্লাহর দয়া ব্যতীত কেউ কি পারবে আখিরাতের ময়দানে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব দিয়ে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার? আর জান্নাত অর্জন করার? এজন্য আশা এবং ভয় উভয়ের সমন্বয়েই পরিপূর্ণ শরীয়তের প্রতি অনুগত হতে হবে। - সম্পাদক

[১৪৪] বুখারী (৪৩২৪) ও মুসলিম (২১৮১)।



কখনো স্ত্রীর ব্যাপারে মন্দ ধারণা রাখতেন না, বরং ছাড় দিতেন

শিক্ষাও পাই, অনিশ্চিত ব্যাপারগুলো থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে।” <sup>১৪৫</sup>

নবীজির ﷺ স্ত্রীর জন্য গাইরাহ কাজ করত, যা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অনুসরণীয়। আফসোসের কথা হলো, অনেক মুসলিম আজ ইসলামের গণ্ডির বাইরে চলে গিয়েছে এবং নিজ স্ত্রীর সৌন্দর্য তারা প্রদর্শন করে বেড়ায়। এভাবে তারা মুসলিম-সমাজের অন্যদের মাঝেও গাইরাহকে <sup>১৪৬</sup> হালকা করে দিচ্ছে।

## কখনো স্ত্রীর ব্যাপারে মন্দ ধারণা রাখতেন না, বরং ছাড় দিতেন

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ রাতে সফর থেকে ফিরলে তাঁর স্ত্রীদের সাথে দেখা করতেন না। এ-ক্ষেত্রে সকাল কিংবা সূর্যাস্তের পরই শুধু তিনি ﷺ ঘরে ঢুকতেন। <sup>১৪৭</sup>

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, “নবীজি ﷺ নিষেধ করেছেন যে, কেউ যেন গোপনে বাসায় ফিরে না আসে, সন্দেহ না করে এবং তারা কী করছে, তা যেন লুকিয়ে না দেখে। তাদের দোষ যেন খুঁজে না বেড়ায়।” <sup>১৪৮</sup>

দীর্ঘ সফর শেষে হঠাৎ না জানিয়ে গোপনে বাসায় ঢোকা অনুচিত। তবে বাইরে কম সময়ের জন্য থাকলে এবং আগে থেকেই তার ফেরার সময় জানা থাকলে রাতে ঘরে ফিরতে সমস্যা নেই।

ইবনে হাজর রাহ. বলেন, “এই হাদীস স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সহানুভূতি ও ভালোবাসার উদ্রেক করে। যদিও তারা একে অপরের খুঁটিনাটি দোষগুণ সম্পর্কে বেশ ভালোভাবে জানে, তারপরও আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন স্বামী যেন গোপনে রাতে বাসায় না ফেরে।

[১৪৫] ফাতহুল বারী (৩৩৬/৯)।

[১৪৬] গাইরাহ: গাইরাহ বলতে সূক্ষ্ম আত্মমর্যাদাবোধ বোঝায়। নারীর শালীনতা তার মর্যাদার অংশ। তাই গাইরে মাহরাম তথা যাদের সাথে পর্দা ফরজ তাদের সামনে বেপর্দার সাথে উপস্থিত হওয়া নিঃসন্দেহে আত্মমর্যাদাবোধের বিপরীত কাজ। আর স্ত্রীর মর্যাদার সাথে স্বামীর মর্যাদা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই রাসূল ﷺ নিজ স্ত্রীদের জন্য মর্যাদাহানি হবে এরকম কাজকে নিজের জন্যেও মর্যাদাহানি ভাবতেন আর সেসবের ব্যাপারে তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ খুব জাগ্রত/সক্রিয় ছিল। - সম্পাদক

[১৪৭] বুখারী (১৮০০) ও মুসলিম (১৯২৮)।

[১৪৮] বুখারী (১৮০১) ও মুসলিম (৭১৫)।

নাহলে হয়তো সে স্ত্রীকে এমন কোনো অবস্থায় দেখে ফেলতে পারে, যা তার পছন্দ নাও হতে পারে।” ১৪৯

আগে থেকে জানিয়ে ঘরে ফিরে এলে স্ত্রীও স্বামীর জন্য সাজগোজ করে স্বামীকে বরণ করার সময় পায়। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ রাতে (সফর থেকে) ফিরে এলে সাথে সাথেই স্ত্রীর সাথে যেন দেখা না করে, বরং তাকে যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার সুযোগ দেয় এবং এলোমেলো চুল সাজানোর সময় দেয়।” ১৫০

ইবনে হাজর রাহ. বলেন, “যে-লোক সকালে কাজ করতে বেরিয়ে যায় এবং রাতে বাসায় ফিরে আসে, তার অবস্থা নিশ্চয়ই তার থেকে আলাদা, যে লম্বা সফরে বের হয় এবং হঠাৎ ফিরে আসে। প্রথম ক্ষেত্রে স্ত্রী জানে অমুক সময়ে সে ফিরে আসবে, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্ত্রীর কাছে, তা অজানা। হাদীসে দ্বিতীয় পরিস্থিতির কথা বলা হচ্ছে। এভাবে হঠাৎ ফিরে এলে স্ত্রীকে অপরিচ্ছন্ন ও অগোছালোভাবে দেখে স্বামীর ভালো নাও লাগতে পারে, যা তাদের মাঝে বিরক্ত ও অসন্তোষের উদ্রেক করবে।” ১৫১

অবশ্য সফর থেকে কবে-কখন ফিরবে, তা আগেই স্ত্রীকে জানিয়ে রাখলে সে-ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই।

## প্রজ্ঞার সাথে স্ত্রীদের ঈর্ষার ব্যাপারগুলো গাঢ়লাতে

আল্লাহ প্রকৃতিগতভাবেই মহিলাদের মাঝে ঈর্ষা তৈরি করে রেখেছেন। নবীজি ﷺ বলেন, “আল্লাহ নারীদের তাকদীরে ঈর্ষা লিখে রেখেছেন।” ১৫২

নবীজির ﷺ স্ত্রীরাও এ-ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নন। তারা তাঁর ﷺ ব্যাপারে ঈর্ষা করতেন। নিচের ঘটনাটি আয়িশার রাযি. ঈর্ষার উদাহরণ।

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “এক রাতে আমার সাথে রাসূলের ﷺ থাকার পালা ছিল। তিনি এসে তার চাদর রেখে দিলেন, জুতা খুলে পায়ের কাছে রাখলেন। এরপর

[১৪৯] ফাতহুল বারী (৩৪১/৯)

[১৫০] বুখারী (৫২৪৬) ও মুসলিম (৭১৫)।

[১৫১] ফাতহুল বারী (৩৪০/৯)।

[১৫২] তাবারানী (১০০৪০)।



নিজ তহবন্দের (লুঙ্গি) একদিক বিছানায় বিছিয়ে কাত হয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছু সময় পার হলে তাঁর ধারণা হলো, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। তখন তিনি উঠে ধীরে ধীরে তাঁর চাদর নিলেন এবং জুতা পরলেন। তারপর আস্তে করে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন।<sup>১৫৩</sup> আমি আমার মাথা ঢেকে, পর্দা গায়ে দিলাম এবং কোমরবন্ধনি শক্ত করে পরলাম। তারপর তাঁর পেছনে রওয়ানা হলাম। যেতে যেতে তিনি বাকীতে (কবরস্থানে) পৌঁছলেন। সেখানে তিনি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর তিনি তিনবার হাত উঠিয়ে দুআ করলেন। এবার গৃহের দিকে ফিরে রওয়ানা দিলে আমিও রওয়ানা হলাম। তিনি ۞ দ্রুত হাঁটতে লাগলেন, আমিও হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলাম। এরপর তিনি দৌড়াতে আরম্ভ করলে আমিও দৌড়াতে লাগলাম এবং তার আগেই ঘরে ঢুকে পড়লাম এবং দেরি না করে শুয়ে পড়লাম।

একটু পরে তিনি ঘরে ঢুকে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আয়িশা, তুমি কেন হাপাচ্ছ? আয়িশা রাযি. বলেন, আমি জবাব দিলাম, ‘না, তেমন কিছু না।’ রাসূলুল্লাহ ۞ বললেন, ‘হয় তুমি আমাকে ব্যাপারটা খুলে বলবে নতুবা মহান আল্লাহ আমাকে তা জানিয়ে দেবেন।’ আমি বললাম, ‘আল্লাহর রাসূল, আপনার ওপর আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক।...’ এরপর তাঁকে পুরো ব্যাপার খুলে বললাম। তিনি বললেন, ‘তুমিই তা হলে সেই কালো ছায়া, যা আমি আমার সামনে দেখছিলাম।’ আমি বললাম, ‘হ্যাঁ।’ তিনি ۞ আমার বুকে বাড়ি মারলেন, তাতে আমি ব্যথা পেলাম। তারপর বললেন, ‘তুমি কি ধারণা করেছ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার ওপর অবিচার করবেন?’<sup>১৫৪</sup>

রাসূলুল্লাহ ۞ বললেন, ‘যখন তুমি আমাকে দেখেছ, সে-সময় আমার কাছে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এসে আমাকে ডাকছিলেন। অবশ্য তা তোমার কাছে গোপন রাখা হয়েছে। আর আমিও তা গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় মনে করে তোমার নিকট গোপন রেখেছিলাম। যেহেতু তুমি তোমার কাপড় রেখে দিয়েছ, তাই তিনি তোমার কাছে আসেননি। আমি ভেবেছিলাম, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ, তাই তোমাকে জাগানো ঠিক হবে না, ভাবলাম। আর আমার আশঙ্কা হচ্ছিল, তুমি ভয় পেয়ে যেতে পার।

এরপর জিবরীল (আ) বললেন, ‘আপনার প্রভু আপনার প্রতি আদেশ করছেন

[১৫৩] আল্লাহর রসূল ۞ দরজা আস্তে লাগালেন এই সাবধানতায়—হয়তো আয়িশা (রা) জেগে উঠবেন অথবা তার ঘুম পাতলা হয়ে যাবে এবং রাতে অন্ধকারে নিজেই ঘরে একা দেখে ভয় পেয়ে যাবেন।

[১৫৪] এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার কারণ হলো, তার পালা রেখে অন্য কোনো স্ত্রীর কাছে রাতে যাওয়া রাসূলের ۞ জন্য অন্যায় করা হয়ে যাবে।

বাকীর কবরবাসীদের কাছে গিয়ে তাদের জন্য দুআ-ইসতিগফার করতে।’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘জিবরীল, আমি তাদের জন্য কীভাবে দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করব?’ তিনি বললেন, ‘আপনি বলবেন,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُونَ غَدًا،  
مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا، إِن شَاءَ اللَّهُ، بِكُمْ لَاحِقُونَ

“এ-বাসস্থানের অধিবাসী ঈমানদার মুসলিমদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। আমাদের মধ্য থেকে যারা আগে বিদায় গ্রহণ করেছে, আর যারা পিছনে বিদায় নিয়েছে, সবার প্রতি আল্লাহ দয়া করুন। আল্লাহ চান তো আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব।” ১৫৫

রাসূলের ﷺ কাছে অন্য বিবিদের তুলনায় আয়িশার রাযি. এর বিশেষ মর্যাদা ছিল, যা তিনি ভালোভাবেই জানতেন। তারপরও আয়িশা রাযি. তাঁর ﷺ অন্য স্ত্রীদের ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত ছিলেন। এমনকি তিনি তাঁর ﷺ মৃত স্ত্রীর ব্যাপারেও ঈর্ষাবোধ করতেন এবং বলতেন, “আমি কাউকেই এতটা ঈর্ষা করতাম না, যতটা খাদিজাকে করতাম।” ১৫৬

আল্লাহর রাসূল ﷺ স্ত্রীদের ঈর্ষার ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া দেখাতেন না। বর্তমানে তো অনেক পুরুষ তাদের স্ত্রীর এমন আচরণে প্রচণ্ড বিরক্তি প্রকাশ করে। তারা কী করে না করে সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে স্ত্রীকে নিষেধ করে। এতে করে স্ত্রীর অন্তরে ঈর্ষা তো কমেই না, বরং আরও বাড়ে।

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, “নবীজি ﷺ এক স্ত্রীর (আয়িশা) ঘরে ছিলেন; তখন অন্য এক উম্মুল মুমিনীন (স্ত্রী) ১৫৭ এক পাত্রে করে তাঁর জন্য খাবার পাঠালেন। যে স্ত্রীর ঘরে নবীজি ﷺ ছিলেন, তিনি (ঈর্ষাবশত) তার হাত দাসের হাতে ধাক্কা দিলেন, এতে পাত্র পড়ে ভেঙে গেল। নবীজি ﷺ ভাঙা টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে তাতে পড়ে-যাওয়া খাবারগুলো তুলতে লাগলেন। আর হাসতে হাসতে বললেন, “তোমাদের মা (আমার স্ত্রী) ঈর্ষা করেছে।” এরপর তিনি ﷺ খাদেমকে থামালেন এবং যে-স্ত্রীর ঘরে ছিলেন তার থেকে আরেকটি পাত্র নিয়ে যে-স্ত্রীর পাত্র ভেঙে গিয়েছে, তাকে (ফেরত) দেওয়ার

[১৫৫] মুসলিম (৯৭৪)

[১৫৬] বুখারী (৩৮১৬) ও মুসলিম (২৪৩৫)

[১৫৭] কিছু হাদিস অনুসারে এটি উম্মু সালামা ছিলেন। কিছু হাদিস অনুসারে এটি যাইনাব বিনতে জাহশ ছিলেন।



জন্য দিলেন। ভাঙা পাত্রের অংশগুলো সে-বাসাতেই রেখে দিলেন।” ১৫৮

এই ঘটনা স্ত্রীদের প্রতি নবীজির ۞ উদারতা ও সহনশীলতার অনুপম উদাহরণ। তিনি পাত্র ভেঙে ফেলার কারণে তাকে বকা দিলেন না বা রেগেও গেলেন না। তিনি ۞ তার ঈর্ষার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন। আবার অপর স্ত্রীর অধিকারও যেন ক্ষুণ্ণ না হয়, সেজন্য আরেকটি পাত্র পাঠিয়ে দিলেন।

ইবনে হাজার রাহ. বলেন, “এই ঘটনা মহিলাদের ঈর্ষার ব্যাপারে আমাদের ক্ষমা করার শিক্ষা দেয়। কারণ, তারা ঈর্ষার কারণে রেগে গিয়ে এরকম কাজ করে বসে।” ১৫৯

আয়িশা বলেন, “আমি নবীজিকে ۞ বললাম, সাফিয়্যার অমুক অমুক ব্যাপারগুলোই তো আপনার জন্য যথেষ্ট (তিনি বোঝাতে চাচ্ছিলেন সাফিয়্যা উচ্চতায় খাট ছিলেন)। তিনি ۞ শুনে বললেন, “তুমি যে-কথাগুলো বললে, সেগুলো সমুদ্রে মিশিয়ে দেওয়া গেলে সারা সমুদ্র দূষিত হয়ে যেত।” ১৬০

মুবারাকপুরী রাহ. বলেন, “এর অর্থ হলো, তার গিবতের এই কথাগুলো সমুদ্রের জলে মিশিয়ে দেওয়া গেলে পরিমাণে প্রচুর হওয়া সত্ত্বেও পুরো সমুদ্রের জলকে দূষিত করে ফেলত। এত প্রচুর জিনিসকে যদি এত ছোট কাজ দূষিত করে দিতে পারে, তা হলে সমুদ্রের পানির চেয়ে পরিমাণে অনেক কম মানুষের আমলে এ-ধরনের কাজ কতটা ভয়ংকর প্রভাব ফেলতে পারে!” ১৬১

[১৫৮] বুখারী (৫২৩৫)

[১৫৯] ফাতহুল বারী (৩২৫/৯)

[১৬০] আবু দাউদ (৪৮৭৫) এবং তিরমিযী (২৫০২)

[১৬১] তুহফাতুল আওয়াযী (১৭৭/৭)।

## দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

### যেভাবে নবীজি ﷺ বৈবাহিক জগজ্জ্যার জগ্গাধান করতেন

আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদের পারিবারিক জীবনে আক্ষরিক অর্থেই আল্লাহর এই কথাগুলো বাস্তবায়ন করতে পেরেছিলেন—“তাদের সাথে দয়ার্দ্ৰ জীবন যাপন করো।” (আল কুরআন, ৪ : ১৯)

কোনো ঘরই সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। এমনকি নবীজির ﷺ ঘরে হঠাৎ কোনো কোনো দিন সমস্যা হতো। যেহেতু নবীজি ﷺ আমাদের অনুসরণীয় আদর্শ, তাই তাঁর সমস্যা ও সমাধানগুলো আমাদের জন্য শিক্ষণীয়।

প্রত্যেক স্বামীর জন্য এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ পারিবারিক সমস্যা আসলে কোনো বিপদ নয়; বরং আসল বিপদ হলো, সমস্যা তৈরি হলে তার সমাধান করতে ব্যর্থ হওয়া। ফলে সম্পর্কে দূরত্ব বাড়তে থাকে এবং একপর্যায়ে বিচ্ছেদের পথে দম্পতির পা বাড়ায়।

নবীজির ﷺ পরিবার বিভিন্ন কঠিন সময় পার করেছে। ইফকের ঘটনা, নবীজির ﷺ স্ত্রীদের খরচ বাড়ানোর দাবির ঘটনা, মারিয়ার ঘটনা এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে আমরা এখন আলোচনা করব।

### ইফকের ঘটনা

আয়িশার রাযি. জন্য বেশ কঠিন পরীক্ষা ছিল এই ঘটনা। বেশ কিছু ঘটনার পরিক্রমা শেষে আল্লাহ সাত আসমানের ওপর থেকে তার পবিত্রতা প্রমাণ করেছেন।

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে বের হবার ইচ্ছা করলে স্ত্রীদের মধ্যে লটারি করে সফর-সঙ্গিনী নির্বাচন করতেন। তাঁদের মধ্যে যার নাম বেরিয়ে



আসত, তাকেই তিনি নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এক যুদ্ধে যাবার সময় তিনি আমাদের মধ্যে লটারি করলেন, তাতে আমার নাম এলো। তাই আমি তাঁর সঙ্গে (সফরে) বের হলাম। এটি পর্দার নির্দেশ নাযিল হবার পরের ঘটনা। আমাকে হাওদার <sup>১৬২</sup> ভেতরে সাওয়ারিতে উঠানো হত, আবার হাওদায় থাকা অবস্থায় নামানো হত। এভাবেই আমরা সফর করতে থাকলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ যুদ্ধ শেষ করে (বাহিনী নিয়ে) ফিরে আসতে লাগলেন। আমরা মদীনার কাছাকাছি পৌঁছেছি, এমন এক রাতে তিনি স্থান ত্যাগ করার ঘোষণা দিলেন। ঘোষণা শুনে আমি উঠে সেনাদলকে অতিক্রম করে গেলাম এবং নিজের প্রয়োজন সেরে হাওদায় ফিরে এলাম। তখন বুকে হাত দিয়ে দেখি আমার আয়ফার দেশীয় সাদা ও কালো পাথরের তৈরি মালাটা ছিঁড়ে পড়ে গেছে। তখন আমি আমার মালার সন্ধানে ফিরে গেলাম, খুঁজতে গিয়ে দেরি করে ফেললাম।

ওদিকে যারা আমার হাওদা উঠিয়ে দিত, তারা তা উঠিয়ে যে উটে আমি সওয়ার হতাম তার পিঠে রেখে দিল। তাদের ধারণা ছিল যে, আমি হাওদাতেই আছি। তখনকার মেয়েরা হালকা-পাতলা ছিল, তেমন মোটাসোটা হতো না। কারণ, তারা খুব সামান্য খাবার খেতে পেত। তাই হাওদা উঠাতে গিয়ে ভার তাদের নিকট অস্বাভাবিক মনে হয়নি; উপরন্তু সে-সময় আমি অল্প বয়স্কা কিশোরী ছিলাম। তারা হাওদা উঠিয়ে উট হাঁকিয়ে রওনা হয়ে গেল।

এদিকে সেনাদল চলে যাবার পর আমি আমার মালা পেয়ে গেলাম। কিন্তু তাদের জায়গায় ফিরে এসে দেখি, সেখানে কেউ নেই। তখন আমি আমার জায়গায় এসে বসে থাকলাম। আমার ধারণা ছিল যে, আমাকে না পেয়ে আবার এখানে তারা ফিরে আসবে। বসে থাকা অবস্থায় আমার দু চোখে ঘুম আসায় ঘুমিয়ে পড়লাম।

সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল, যিনি প্রথমে সুলামী এবং পরে যাকওয়ানী হিসাবে পরিচিত ছিলেন, সেনাদলের পিছনে (পরিদর্শক হিসাবে) রয়ে গিয়েছিলেন। সকালের দিকে আমার অবস্থানস্থলের কাছাকাছি এসে পৌঁছলেন এবং একজন ঘুমন্ত মানুষের শরীর দেখতে পেয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন।

পর্দার বিধান নাযিলের আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তিনি উটে বসেছিলেন, আমি তার 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' শব্দে জেগে উঠলাম। তিনি উটের

[১৬২] হাওদা হল উটের পিঠে বসার আসনবিশেষ।

সামনে পা চেপে ধরলে আমি তাতে সওয়ার হলাম। আর তিনি আমাকে নিয়ে সাওয়ারি হাকিয়ে চললেন। সেনাদল ঠিক দুপুরে যখন বিশ্রাম করছিল, তখন আমরা সেনাদলে পৌঁছলাম।

যারা আমার ব্যাপারে সন্দেহ করছিল তারা ধবংস হোক। অপবাদ রটনায় নেতৃত্ব দিয়েছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল। আমরা মদিনায় উপস্থিত হলাম। এসেই আমি একমাস অসুস্থ ছিলাম। এদিকে কিছু লোক অপবাদ রটনাকারীদের রটনা ছড়াতে থাকল। আমার অসুস্থতার সময় আমার সন্দেহ হলো, নবীজি ﷺ আমাকে সেরকম স্নেহ করছেন না, যেমনটা আমার অসুস্থতার সময় সচরাচর আমি অনুভব করতাম। তিনি শুধু ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিয়ে বলতেন, ‘কেমন আছ?’

আমি সে-বিষয়ের (ইফকের) কিছুই জানতাম না। আমার স্বাস্থ্য একটু ভালো হলে (একরাতে) আমি ও উম্মে মিসতাহ বাইরে বের হলাম। ইত্যবসরে সে তার চাদরে পা জড়িয়ে হোঁচট খেল এবং বলল, “মিসতাহর জন্য দুর্ভোগ।” আমি তাকে বললাম, “তোমার কথার জন্য দুর্ভোগ হোক। বদর যুদ্ধে শরিক হয়েছে এমন এক ব্যক্তিকে তুমি অভিশাপ দিচ্ছ!” সে বলল, “সরলমনা মেয়ে! যে-সব কথা তারা রটিয়েছে, তা তুমি শোনোনি?” এরপর অপবাদ রটনাকারীদের সব রটনা সম্পর্কে সে আমাকে বলল। সে-সব শুনে আমার অসুস্থতা বেড়ে গেল।

আমি ঘরে ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কেমন আছ?’ আমি বললাম, ‘আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাবার অনুমতি দিন।’ তিনি (আয়িশা রাযি.) বলেন, ‘আমি তখন তাদের (পিতা-মাতার) নিকট হতে এ-সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অনুমতি দিলেন।

আমি আমার পিতা-মাতার কাছে গেলাম। আমি আমার মাকে বললাম, ‘লোকেরা কী বলাবলি করছে?’ তিনি বললেন, ‘মেয়ে আমার, ব্যাপারটি নিজের জন্য সহজভাবে নাও। আল্লাহর শপথ, এমন সুন্দরী রমণী খুব কমই আছে, যাকে তার স্বামী ভালোবাসে আর তার একাধিক সতীনও আছে; অথচ ওরা তাকে উত্যক্ত করে না।’ আমি বললাম, ‘সুবহানাল্লাহ! লোকেরা সত্যি তবে এ-সব কথা রটিয়েছে?’

তিনি (আয়িশা) বলেন, ‘ভোর পর্যন্ত সে-রাত আমার এমনভাবে কেটে গেল যে, চোখের পানি আমার বন্ধ হল না, ঘুমের একটু পরশও আমি পেলাম না—এভাবে ভোর হলো। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর বিলম্ব দেখে আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগের ব্যাপারে



ইবনে আবু তালিব ও উসামা ইবনে যায়দকে ডেকে পাঠালেন। পরিবারের জন্য তাঁর   ভালোবাসার প্রতি লক্ষ্য করে উসামা পরামর্শ দিয়ে বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কসম (তার সম্পর্কে) ভালো ব্যতীত অন্য কিছু আমরা জানি না।’

আলী ইবনে আবু তালিব রাযি. বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল, কিছুতেই আল্লাহ আপনার পথ সংকীর্ণ করেননি। সে ছাড়াও আরও অনেক নারী আছে। আপনি নাহয় দাসীকে জিজ্ঞেস করুন, সে আপনাকে সত্য কথা বলবে।’ রাসূলুল্লাহ   তখন (দাসী) বারীরাতে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘বারীরা, তুমি কি তার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেয়েছ?’ বারীরা বলল, ‘আপনাকে যিনি সত্যসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম করে বলছি, না, তেমন কিছু দেখিনি। শুধু একটি অবস্থাতেই দেখেছি যে, তিনি অল্পবয়স্কা কিশোরী—তাই আটা খামির করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। সেই ফাঁকে বকরি এসে তা খেয়ে ফেলে।’

সে-দিনই রাসূলুল্লাহ   ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে আবদুল্লাহ ইবনে ‘উবাই ইবনে সালুলের ষড়যন্ত্র হতে বাঁচার উপায় জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ   বললেন, ‘আমার পরিবারকে কেন্দ্র করে যে-ব্যক্তি আমাকে জ্বালাতন করেছে, তার মোকাবেলায় কে প্রতিকার করবে? আল্লাহর কসম, আমি তো আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভালো ব্যতীত অন্য কিছু জানি না। আর এমন ব্যক্তিকে জড়িয়ে তারা কথা তুলেছে, যার সম্পর্কে ভালো ব্যতীত অন্য কিছু জানি না। আর সে তো আমার সঙ্গে ব্যতীত আমার ঘরে কখনো প্রবেশ করত না।’

তখন সাদ (ইবনে মুআয) রাযি. দাঁড়িয়ে বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কসম, আমি তার প্রতিকার করব। যদি সে আউস গোত্রের কেউ হয়ে থাকে, তা হলে তার গর্দান উড়িয়ে দেব; আর যদি সে আমাদের খায়রাজ গোত্রীয় ভাইদের কেউ হয়, তা হলে আপনি তার ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ দেবেন, আমরা আপনার নির্দেশ পালন করব।’

খায়রাজ গোত্রপতি সাদ ইবনে উবাদা রাযি. তখন দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি উত্তম ব্যক্তিত্বই ছিলেন। কিন্তু গোত্রপ্রীতি তাকে পেয়ে বসল। তিনি বললেন, ‘তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম, তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না, সে শক্তি তোমার নেই।’ তখন উসায়িদ ইবনে হুযাইর রাযি. দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, ‘তুমিই মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম, আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করে ছাড়ব। আসলে তুমি একজন



মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ নিয়ে বাগড়ায় লিপ্ত হয়েছে।”

এরপর আউস ও খায়রাজ উভয় গোত্রই উত্তেজিত হয়ে উঠল। এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ মিস্বারে থাকা অবস্থাতেই তারা (লড়াইয়ে) উদ্যত হল। তখন তিনি নেমে তাদের চূপ করালেন। সবাই শান্ত হলো আর তিনিও নীরবতা অবলম্বন করলেন।

আয়িশা রাযি. বলেন, সে-দিন সারাক্ষণ আমি কাঁদলাম, চোখের পানি আমার শুকাল না এবং ঘুমের সামান্য পরশও পেলাম না। আমার পিতা-মাতা আমার পাশে পাশেই থাকলেন। পুরো রাত-দিন আমি কেঁদেই কাটালাম। আমার মনে হলো, কান্না বুঝি আমার কলিজা বিদীর্ণ করে দেবে। তিনি (আয়িশা) বলেন, তারা (পিতা-মাতা) উভয়ে আমার কাছেই বসে ছিলেন, আর আমি কাঁদছিলাম। ইতিমধ্যে এক আনসারী মহিলা ভেতরে আসার অনুমতি চাইল। আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সেও আমার সঙ্গে বসে কাঁদতে শুরু করল। আমরা এ অবস্থায় থাকতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রবেশ করে বসলেন, অথচ যে-দিন হতে আমার সম্পর্কে অপবাদ রটানো হয়েছে সে-দিন হতে তিনি আমার কাছে বসেননি—এর মধ্যে এক মাস কেটে গিয়েছিল, অথচ আমার সম্পর্কে তাঁর নিকট কোনো ওহী নাযিল হলো না।

আয়িশা রাযি. বলেন, “হামদ ও সানা পাঠ করে তিনি ﷺ বললেন, “আয়িশা, তোমার সম্পর্কে এ-ধরনের কথা আমার নিকট পৌঁছেছে। তুমি নির্দোষ হলে আল্লাহ অবশ্যই তোমার নির্দোষিতা ঘোষণা করবেন। আর যদি তুমি কোনো গুনাহে জড়িয়ে গিয়ে থাক, তা হলে আল্লাহর নিকট তাওবা ও ইসতিগফার কর। কেননা, বান্দা নিজের পাপ স্বীকার করে তাওবা করলে আল্লাহ তাওবা কবুল করেন।” তাঁর কথা শেষ হওয়ামাত্র আমার কান্না বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি এক ফোঁটা জলও এলো না। আমার পিতাকে বললাম, “রাসূলুল্লাহকে ﷺ আমার পক্ষ হতে জবাব দিন।” তিনি বললেন, “আল্লাহর কসম, আমি বুঝছি না, রাসূলুল্লাহকে ﷺ কী বলব?” তখন আমার মাকে বললাম, “আমার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহর ﷺ কথার জবাব দিন।” তিনিও বললেন, “আল্লাহর কসম, আমি বুঝছি না, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কী বলব?” আমি তখন অল্পবয়স্কা কিশোরী। কুরআনও খুব বেশি মুখস্থ হয়নি। তবুও আমি বললাম, “আল্লাহর কসম, আমার জানতে বাকি নেই, লোকেরা কী রটাচ্ছে; তা আপনারা শুনতে পেয়েছেন এবং আপনাদের মনে তা বসে গেছে—ফলে আপনারা তা বিশ্বাস করে নিয়েছেন। এখন যদি আমি আপনাদের বলি যে, আমি নিষ্পাপ; আর আল্লাহ



জানেন, আমি অবশ্যই নিষ্পাপ—তবু আপনারা আমার সে-কথা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আপনাদের নিকট কোনো বিষয় আমি স্বীকার করি, অথচ আল্লাহ জানেন, আমি নিষ্পাপ, তা হলে অবশ্যই আপনারা আমাকে বিশ্বাস করে নেবেন। আল্লাহর কসম, ইউসুফের (আ) পিতার ঘটনা ব্যতীত আমি আপনাদের জন্য কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাচ্ছি না। যখন তিনি বলেছিলেন, “পূর্ণ ধৈর্যধারণই আমার জন্য উত্তম। আর তোমরা যা বলছ, সে-বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যকারী।” (আল কুরআন, ১২:১৮)

এরপর আমি বিছানায় অন্য কাত হলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, অবশ্যই আল্লাহ আমাকে নির্দোষ ঘোষণা করবেন। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি ভাবিনি যে, আমার ব্যাপারে কোনো ওহী নাযিল হবে। কুরআনে আমার ব্যাপারে কোনো কথা বলা হবে, এ-বিষয়ে আমি নিজেকে উপযুক্ত মনে করি না। তবে আমি আশা করছিলাম যে, নিদ্রায় আল্লাহর রাসূল এমন কোনো স্বপ্ন দেখবেন, যা আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করবে। কিন্তু আল্লাহর কসম, তিনি তাঁর আসন ছেড়ে তখনো উঠে যাননি এবং ঘরের কেউ বেরিয়েও যায়নি, এরই মধ্যে তাঁর উপর ওহী নাযিল হওয়া শুরু হয়ে গেল এবং (ওহী নাযিলের সময়) তিনি যে-রকম কঠিন অবস্থার সন্মুখীন হতেন, সে-রকম অবস্থার সন্মুখীন হলেন। এমনকি সে-মুহূর্তে—শীতের দিনেও তাঁর শরীর হতে মুক্তার মতো ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরে পড়তে লাগল।

যখন রাসূলুল্লাহর ﷺ ওহীর অবস্থা কেটে গেল, তিনি হাসতে লাগলেন। আর প্রথম যে বাক্যটি তিনি উচ্চারণ করলেন—তা হলো, আমাকে বললেন, “আয়িশা, আল্লাহর প্রশংসা করো। তিনি তোমাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন।” আমার মা তখন আমাকে বললেন, “রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে যাও (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর)।” আমি বললাম, “না। আল্লাহর কসম, আমি তাঁর কাছে যাব না এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও প্রশংসাও করব না।” আল্লাহ নাযিল করলেন, “নিশ্চয়ই অপবাদ আরোপকারীরা তোমাদের মধ্য থেকেই কিছু মানুষ;” (আল কুরআন, ২৪:১১-২০) এবং আরও দশটি আয়াত। ১৬৩

ইফকের ঘটনায় রাসূল ﷺ যেভাবে তাঁর স্ত্রীর সাথে ব্যবহার করেছেন, তা থেকে আমরা কিছু শিক্ষা পাই—

১। যাচাই করার দূরদর্শিতা : নবীজি ﷺ তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ মেনে নেওয়ার আগে সে-ব্যাপারে তদন্ত করেছেন। তিনি তড়িৎগতিতে কোনো সিদ্ধান্তে যাননি। পুরো এক মাস ধরে সময় নিয়ে তিনি ﷺ অপেক্ষা করেছেন, তদন্ত করেছেন এবং সবশেষে সে-ব্যাপারে আয়িশার রাযি.-এর সাথে কথা বলেছেন।

২। আচরণে পরিবর্তন আনা : নবীজি ﷺ আয়িশার রাযি. সাথে ব্যবহারে পরিবর্তন এনেছিলেন। তিনি কম কম দেখা করতেন, কম কম খোঁজ নিতেন। তবে যেহেতু তখনো তার দোষ প্রমাণিত হয়নি—তাই একেবারেই তাকে ছেড়ে যাননি, বরং মাঝে মাঝে খোঁজখবরও নিতেন। আবার পুরো ভালোবাসাও দেখাননি এটা বোঝাতে যে, কিছু একটা সমস্যা হয়েছে।

ইবনে হাজর রাহ. বলেন, “এ-ঘটনা থেকে আমরা শিখতে পারি, স্বামীর উচিত স্ত্রীর সাথে কোমলভাবে আচরণ করা এবং নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তে না পৌঁছা। আবার তার উচিত স্ত্রীকে ইঙ্গিতে বোঝানো যে, কিছু একটা সমস্যা হয়েছে, যেন স্ত্রী তার সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে এবং দোষ বুঝতে পেরে স্বীকার করে।” ১৬৪

৩। মতামত ও পরামর্শ লাভের পদ্ধতি : আল্লাহর রাসূল ﷺ আয়িশা রাযি. যেন জানতে না পান সে-রকম গোপনীয়তা অবলম্বন করে তার ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছেন। তিনি ﷺ এজন্য আলী ইবনে আবু তালিব, যায়নাব বিনতে জাহশ এবং আয়িশার রাযি. দাসীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তার ব্যাপারে। এদের প্রত্যেকেই জিজ্ঞেস করার পেছনে কারণ ছিল। যেমন আলি ও উসামা রাযি. খুব কাছ থেকে রাসূলের ﷺ সাথে ওঠাবসা করতেন।

ইবনে হাজর রাহ. বলেন, “তিনি ﷺ এ-ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করার পেছনে কারণ ছিল। আলী রাযি. ছোট থেকে তাঁর বাসায় বড় হয়েছেন এবং পরে ফাতিমার সাথে বিয়ের পর তাঁর পরিবারের সাথে সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে। উসামা রাযি.-ও নবীজির ﷺ খুব কাছ থেকে মিশতেন এবং তাঁর অন্যতম প্রিয় সাহাবী ছিলেন। এ-ছাড়াও তারা দুজনে তরুণ সাহাবী ছিলেন। তাই তারা সঠিক কথা বলার ব্যাপারেও বেশি তৎপর থাকবেন, এমনটিই স্বাভাবিক—এটি বয়স্কদের ক্ষেত্রে হয় না; কারণ, তারা কথা বলার আগে অনেক ভাবনাচিন্তা করেন এবং তারা যা জানেন তা নাও



বলতে পারেন।” ১৬৫

নারীদের মধ্যে নবীজি ﷺ দুজনকে জিজ্ঞেস করেছেন—নবীজির ﷺ স্ত্রী যায়নাবকে এবং ঘরের খাদেমাকে—যে আয়িশাকে রাখি। অনেক ঘনিষ্ঠভাবে কাছ থেকে দেখত। তদন্ত-কাজে ব্যক্তি নির্বাচনে এবং একইসাথে আয়িশার রাখি। সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে নবীজির ﷺ পদক্ষেপ ছিল অত্যন্ত সুচিন্তিত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ।

তদন্ত-শেষে রাসূল ﷺ তাঁর সিদ্ধান্তে এলেন এবং এ-ঘটনায় দোষীদের—বিশেষত আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে—শাস্তিদানের ইচ্ছা তিনি ﷺ মিস্বারে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন। এরপর তিনি ﷺ তাঁর স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে বললেন, “আল্লাহর কসম, আমি আমার স্ত্রীর সম্পর্কে ভালো ছাড়া খারাপ কিছু জানি না।” তিনি ﷺ তাঁর স্ত্রীর নির্দোষিতার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন, কিন্তু এ-ব্যাপারে ওহীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

ওহী পাঠাতে বিলম্ব করার মাধ্যমে আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন, এরকম ভঙ্গুর মুহূর্তে আমাদের কীভাবে আগানো উচিত, যেন পারিবারিক বন্ধন ভেঙে না গিয়ে বরং অটুট থাকে।

৪। আয়িশাকে রাখি। যেভাবে তিনি ﷺ সামলালেন : নবীজি ﷺ উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে সরাসরি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যেন সত্য উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।

৫। সত্য প্রকাশ পাবার পর আয়িশার রাখি। প্রতিক্রিয়া : তার মা যখন তাকে বললেন, “রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে যাও (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর)।” তখন তিনি উত্তর দিলেন, “না। আল্লাহর কসম, আমি তাঁর নিকট যাব না এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও প্রশংসাও করব না।”

নববী রাহ. বলেন, “ইফকের ঘটনা থেকে আয়িশা রাখি.-এর পবিত্রতা কুরআন দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং অধিকাংশ আলিমের ঐকমত্য অনুসারে কেউ তার পবিত্রতার ব্যাপারে সন্দেহ করলে অবিশ্বাসী ও মুরতাদ হয়ে যাবে।” ১৬৬

[১৬৫] ফাতহুল বারী (৪৬৯/৮)।

[১৬৬] মুসলিম (১১৭/১৭) গ্রন্থের ব্যাখ্যায় নববী (রাহ.)।

## নবীজির ﷺ স্ত্রীদের ভরণপোষণ বাড়ানোর দাবি করার ঘটনা

নবীজি ﷺ পরিবারে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে কীভাবে কাজ করেছেন তার বিবরণ এ ঘটনায় পাওয়া যায়—

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. এ-ঘটনা বর্ণনা করেন, “আবু বাকর রাযি. এসে রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকটে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি তার দরজায় অনেক লোককে বসাবস্থায় দেখলেন। তবে তাদের কাউকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি।” তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, “এরপর তিনি আবু বাকরকে রাযি. প্রবেশের অনুমতি প্রদান করলে তিনি প্রবেশ করলেন। এরপর উমার রাযি. এলেন এবং তিনি অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তখন তাকেও প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হলো। তিনি নবীজিকে ﷺ চিন্তাযুক্ত ও নীরব বসে থাকতে দেখলেন। তার চারপাশে তার সহধর্মিণীগণ বসে ছিলেন।” <sup>১৬৭</sup> তিনি (বর্ণনাকারী জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি.) বলেন, “উমার রাযি. বললেন, ‘নিশ্চয়ই আমি নবীজির ﷺ নিকটে এমন কথা বলব, যা তাকে হাসাবে।’ এরপর তিনি বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল, আপনি যদি খারিজার কন্যাকে (উমরের রাযি.-এর স্ত্রী) আমার কাছে খোরপোশ (হাতখরচ) তলব করতে দেখতেন, তা হলে (তৎক্ষণাৎ) আপনি তার দিকে অগ্রসর হয়ে তার কাঁধে আঘাত করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে উঠলেন এবং বললেন, ‘আমার চারপাশে তোমরা যাদের দেখতে পাচ্ছ, তারা আমার কাছে খোরপোশ দাবি করছে।’ অমনি আবু বাকর রাযি. আয়িশা রাযি.-এর দিকে ছুটলেন এবং তার ঘাড়ে আঘাত করলেন। উমারও রাযি. দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হাফসার রাযি. দিকে অগ্রসর হয়ে তার ঘাড়ে আঘাত করলেন। তারা উভয়ে বললেন, ‘তোমরা নবীজির ﷺ কাছে এমন জিনিস দাবি করছ, যা তার কাছে নেই।’ তখন তারা (নবীজির ﷺ সহধর্মিণীগণ) বললেন, ‘আল্লাহর কসম, আমরা আর কখনো রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে এমন জিনিস চাইব না, যা তার কাছে নেই।’

এরপর এ-আয়াত নাযিল হলো—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ

[১৬৭] এটি পর্দার আয়াত নাযিলের পূর্বের ঘটনা।



وَأُسْرِي حُكْنًا سَاحًا جَبِيلًا (২৮) وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ  
أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا

“হে নবীজি, আপনি আপনার সহধর্মিণীদের বলে দিন, তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ ও বিলাসিতা কামনা কর, তা হলে এসো আমি তোমাদের ভোগবিলাসের ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকালকে কামনা কর, তা হলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণা, আল্লাহ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।” (আল কুরআন, ৩৩: ২৮-২৯)

তিনি ﷺ আয়িশাকে রাখি. দিয়ে (আয়াতের নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে) শুরু করলেন। তিনি ﷺ বললেন, “আয়িশা, আমি তোমার সাথে একটি (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ে আলাপ করতে চাই। তবে সে-বিষয়ে তোমার পিতামাতার সঙ্গে পরামর্শ না করে তোমার ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করাই আমি পছন্দ করি।” তিনি বললেন, “আল্লাহর রাসূল, আপনার ব্যাপারে আমি কি আমার পিতামাতার কাছে পরামর্শ নিতে যাব? (এর কোনো প্রয়োজন নেই) বরং আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাতকেই বেছে নিয়েছি। তবে আপনার কাছে আমার একান্ত নিবেদন, আমি যা বলেছি, সে-সম্পর্কে আপনি আপনার অন্যান্য স্ত্রীদের কারও কাছে ব্যক্ত করবেন না।” তিনি বললেন, “তাদের যে-কেউ সে-বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি অবশ্যই তাকে বলে দেব। কারণ আল্লাহ আমাকে কঠোরতা আরোপকারী ও অত্যাচারীরূপে নয়, বরং সহজ পন্থায় (শিক্ষাদানকারী) হিসেবে প্রেরণ করেছেন।” এরপর বাকি স্ত্রীদেরও একই ব্যাপার বলা হলো এবং তারাও আয়িশার মতো একই উত্তর দিলেন।<sup>১৬৮</sup>

এ-ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা পাই কীভাবে নবীজি ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সাথে সমস্যা হলে সমাধান করতেন। প্রথমেই তিনি কথা না বাড়িয়ে চুপ ছিলেন। কোনো সমস্যার শুরুতে তর্ক করা কোনো সমাধান আনে না, বরং সমস্যা কে ঘনীভূত করে। দ্বিতীয়ত, তিনি ﷺ তাদেরকে দুটো সুযোগ দিলেন—হয় তারা তার সাথে থাকবে যেভাবে আছে, সেভাবে; নতুবা তারা চাইলে তাকে ছেড়ে চলে যেতে পারেন।

ইসলামী শরীয়াহ এমনটিই শেখায়—যদি স্ত্রী স্বামীর সাধ্যের অতিরিক্ত ভরণপোষণ



দাবি করে, তা হলে স্বামী তাকে তার সাথে থাকার বা তাকে ছেড়ে যাওয়ার সুযোগ দিতে পারেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদেরকে সতর্কতার সাথে ধীরেসুস্থে চিন্তাভাবনা করতে বলেছেন। এ-ধরনের আচরণ বর্তমানে অনেক স্বামীর আচরণের বিপরীত। তারা দেখা যায়, সমস্যায় জড়িয়ে পড়লে তালাকের হুমকি দিতে থাকে। এমনকি বলতে থাকে, ‘তুমি যদি এ-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাও, তা হলে তুমি তালাক। তুমি ফোন ধরলে তালাক। তোমার অমুক-অমুক বান্ধবীর সাথে কথা বললে তালাক।’

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, তিনি ﷺ রেগে গিয়ে আঘাত করেননি, বরং আবু বাকর ও উমার রাযি। তাদের মেয়েদের আঘাত করতে গেলে তিনি ﷺ বাধা দিলেন। কারণ, আঘাত দিয়ে কোনো সমস্যার সমাধান হয় না। বরং আলোচনা ও একে অপরকে বোঝানোর চেষ্টা করার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়। নিজের পরিবারে ধনাঢ্য জীবন ছেড়ে স্বামীর অসচ্ছল পরিবারে (হয়তো স্বামীর আয় কম বা সে ছাত্র বা দরিদ্র) যাওয়ার পর আর্থিক সমস্যার মোকাবেলা করতে হতে পারে। সে-ক্ষেত্রে স্ত্রীর একে তাকদীরের ফয়সালা মেনে নিয়ে সবর করতে হবে। আল্লাহ বলেন, “আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি, যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারো।” (আল কুরআন, ৪৩:৩২)

স্বামীর সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে তাকে খরচের ব্যাপারে চাপাচাপি করা উচিত নয়। এতে করে হয়তো স্ত্রীর চাপে পড়ে সে হারাম পথে পা বাড়াবে। ঘুষ বা চুরির মতো ঘৃণ্য পথে আয় বাড়াবার চেষ্টা করবে। ফলে স্বামী একসময় চাকরি থেকে বহিস্কৃত হতে পারে বা জেলেও যেতে পারে। এর দ্বারা সে একই সাথে তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টিই হারাবে। স্বামীরও মাথায় রাখা উচিত তার স্ত্রী সচ্ছল পরিবার থেকে এসেছে। তাই তার যা পছন্দ, তা পূরণ করায় হালালের মধ্যে থেকে স্বামী সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। স্ত্রী প্রজ্ঞাবান হলে স্বামীর চেষ্টাকে অবশ্যই বুঝতে পারবে এবং স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা আরও বেড়ে যাবে এবং চাহিদা কম থাকবে।



## নবীজির ﷺ সাথে স্ত্রীদের মজা করার ঘটনা

আয়িশা রাযি. বলেন, “রাসূলুল্লাহ ﷺ মিষ্টান্ন দ্রব্য ও মধু পছন্দ করতেন। আসরের সালাত আদায় করে তিনি ﷺ তাঁর স্ত্রীদের কাছে আসা যাওয়া করতেন এবং তাদের সাথে অন্তরঙ্গ হতেন। একবার তিনি হাফসার রাযি. ঘরে প্রবেশ করলেন এবং সাধারণভাবে যত সময় তাঁর কাছে অবস্থান করতেন, তার চেয়ে বেশি সময় তাঁর কাছে অবস্থান করলেন। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তখন আমাকে বলা হলো যে, তার স্বগোষ্ঠীয় এক মহিলা এক কৌটা মধু হাদিয়া পাঠিয়েছে। এ থেকে তিনি আল্লাহর রাসূলকে কিছু পান করিয়েছেন। আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম, আমরা অবশ্যই একটা কৌশল গ্রহণ করব।

এরপর আমি এ-ব্যাপারে সাওদার রাযি. সঙ্গে আলোচনা করলাম। আমি বললাম, ‘যখন তিনি তোমার ঘরে আসবেন, তখন তিনি অবশ্যই তোমার নিকটে যাবেন। এ-সময় তুমি তাঁকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি মাগাফীর <sup>১৬৯</sup> খেয়েছেন? তিনি অবশ্য ‘না’-ই বলবেন।’ তখন তুমি বলবে, ‘তা হলে এ-দুর্গন্ধ কীসের?’ আর রাসূলুল্লাহর ﷺ নিজের থেকে দুর্গন্ধ পাওয়াটা খুবই গুরুতর মনে করতেন। তখন তিনি বলবেন, হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করিয়েছে। তখন তুমি তাঁকে বলবে, তা হলে ঐ মধুর পোকা ‘উরফুত’ গাছের রস সংগ্রহ করেছে। আর আমিও একই কথা বলব। সাফিয়্যা, তুমিও তাঁকে এ-কথা বলবো।’

সাওদা রাযি. বললেন, ‘কসম ঐ সত্তার, যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। যখনই তিনি দরজার কাছে এলেন, তখনই আমি তোমার ভয়ে তোমার শেখানো কথাগুলো বলতে প্রস্তুত হলাম।’ এরপর তিনি যখন কাছে আসলেন, তখন আমি বললাম, ‘আল্লাহর রাসূল, আপনি ‘মাগাফীর’ খেয়েছেন?’ তিনি বললেন, ‘না।’ আমি বললাম, ‘তা হলে এ-দুর্গন্ধ কীসের?’ তিনি বললেন, ‘হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করিয়েছে।’ আমি বললাম, ‘তা হলে এ মধুর পোকা ‘উরফুত’ গাছের রস সংগ্রহ করেছে।’

আয়িশা রাযি. বলেন, ‘এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমার ঘরে এলেন, তখন আমিও তাঁকে তেমনি কথা বললাম। এরপর তিনি সাফিয়্যা রাযি.-এর ঘরে গেলেন,

[১৬৯] মাগাফির একপ্রকার বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত আঠাকে বলে।



তিনিও তাঁকে তেমনি কথা বললেন। পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হাফসা রাযি.-এর ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল, আপনাকে মধু পান করতে দেব কি?’ তিনি বললেন, ‘এর কোনো প্রয়োজন নেই। আমি আল্লাহর কসম করেছি, আমি এটি আর খাব না। তবে এটা কাউকে বোলো না।’

তখন আল্লাহ এই আয়াতগুলো নাযিল করলেন, “হে নবী, আল্লাহ তোমার জন্য যা হালাল করেছেন, তোমার স্ত্রীদের সম্ভূষ্টি কামনায় তুমি কেন তা হারাম করছ? আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আল্লাহ তোমাদের জন্য নিজেদের কসমের বাধ্যবাধকতা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ তোমাদের মালিক-মনিব-রক্ষক, আর তিনি সর্বজ্ঞাতা, মহা প্রজ্ঞার অধিকারী। স্মরণ কর—যখন নবী তাঁর স্ত্রীদের কোনো একজনকে গোপনে একটি কথা বলেছিল। অতঃপর সে স্ত্রী যখন তা (অন্য একজনকে) জানিয়ে দিল, তখন আল্লাহ এ-ব্যাপারটি নবীকে জানিয়ে দিলেন। তখন নবী (তাঁর স্ত্রীর কাছে) কিছু কথার উল্লেখ করল আর কিছু কথা ছেড়ে দিল। নবী যখন তা তাঁর স্ত্রীকে জানাল, তখন সে বলল, ‘আপনাকে এটা কে জানিয়ে দিল?’ নবী বলল, ‘আমাকে জানিয়ে দিলেন যিনি সর্বজ্ঞাতা, ওয়াকিফহাল।’ যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা কর (তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম)। কারণ, তোমাদের উভয়ের অন্তর বাঁকা হয়েছে, আর তোমরা যদি তার বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য কর, তবে আল্লাহই তার অভিভাবক এবং জিবরীল ও সৎকর্মশীল মুমিনরাও। তা ছাড়া অন্যান্য ফেরেশতারাও তাঁর সাহায্যকারী। নবী যদি তোমাদের সবাইকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে সম্ভবত তাঁর প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে তাঁকে দেবেন তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী—যারা হবে আত্মসমর্পণকারিণী, মুমিনা, অনুগত, তাওবাকারিণী, ইবাদাতকারিণী, রোযা পালনকারিণী—অকুমারী ও কুমারী।” (আল কুরআন, ৬৬: ১-৫) <sup>১৭০</sup>

## স্ত্রীদের থেকে কিছুদিনের জন্য প্রকাণ্ডী থাকার পদ্ধতির জুফল

অতিরিক্ত ভরণপোষণ দাবি করার ঘটনা এবং মধুর ঘটনার পর নবীজি ﷺ স্ত্রীদের থেকে এক মাস দূরে ছিলেন।

[১৭০] বুখারী (৬৯৭২) ও মুসলিম (১৪৭৪)। ঘটনাটি কিছু রিওয়াতে অন্যভাবেও এসেছে। সেসব রিওয়াতে এসেছে যাইনাব রাযি. এর ঘরে মধু পান করেন এবং আয়িশা ও হাফসা রাযি. পরামর্শ করেন।



ইবনে হাজর রাহ. বলেন, “এর কারণ হতে পারে, নবীজি ﷺ এ-সব ঘটনার কারণে বাধ্য হয়ে এক মাস দূরে ছিলেন। বিনয়, ধৈর্য, সহনশীলতা ছিল তাঁর স্বভাবের অংশ; কিন্তু স্ট্রীদের থেকে বারবার এমন আচরণের কারণে দূরে থাকাই তাঁর জন্য উত্তম করণীয় ছিল।”

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি উমার ইবনে খাত্তাবকে রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, “আমীরুল মুমিনীন, যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা কর (তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম)। কারণ, তোমাদের উভয়ের বাঁকা হয়েছে”— এই আয়াতে বর্ণিত নবীজির দুই স্ত্রী কারা? তিনি বললেন, “তোমার প্রশ্নে অবাক হলাম, ইবনে আব্বাস! এ-আয়াতে বর্ণিত দুই মহিলা হলো আয়িশা এবং হাফসা।”

এরপর উমার রাযি. পুরো ঘটনা বলতে শুরু করলেন—“আমি ও আমার এক আনসারী প্রতিবেশী মদীনার অদূরে বনু উমাইয়া ইবনু যায়দের মহল্লায় বসবাস করতাম। আমরা দু’জন পালাক্রমে নবীজির ﷺ কাছে যেতাম। একদিন তিনি যেতেন, আরেকদিন আমি যেতাম; আমি যে-দিন যেতাম, সে-দিনের খবর (ওহী) ইত্যাদি বিষয় তাঁকে অবহিত করতাম। আর তিনি যে-দিন যেতেন, তিনিও অনুরূপ করতেন।

আমরা কুরাইশ গোত্রের লোকেরা মহিলাদের উপর কর্তৃত্ব করতাম। কিন্তু আমরা যখন মদীনায় আনসারদের কাছে এলাম, তখন তাদেরকে এমন পেলাম যে, নারীরা তাদের উপর কর্তৃত্ব করে। ধীরে ধীরে আমাদের মহিলারাও আনসারী মহিলাদের রীতিনীতি গ্রহণ করতে লাগল। একদিন আমি আমার স্ত্রীকে ধমক দিলাম। সে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিউত্তর করল। আর এই প্রতিউত্তর আমার পছন্দ হল না। তখন সে আমাকে বলল, ‘আমার প্রতিউত্তরে আপনি অসন্তুষ্ট হচ্ছেন কেন? আল্লাহর কসম, নবীজির ﷺ স্ত্রীরাও তো তাঁর কথার প্রতিউত্তর করে থাকেন এবং তাঁর কোনো কোনো স্ত্রী রাত পর্যন্ত পুরো দিন তাঁর কাছ হতে আলাদা থাকেন।’

এ-কথা শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম। বললাম, ‘যিনি এ-রূপ করেছেন, তিনি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।’ তারপর আমি জামা-কাপড় পরে (আমার মেয়ে) হাফসার রাযি. কাছে গিয়ে বললাম, ‘হাফসা, তোমাদের কেউ কেউ নাকি রাত পর্যন্ত পুরো দিন রাসূলুল্লাহকে ﷺ অসন্তুষ্ট রাখে?’ সে বলল, ‘হ্যাঁ।’ আমি বললাম, ‘তবে তো সে বরবাদ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তোমার কি ভয় হয় না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহও অসন্তুষ্ট হবেন! এর ফলে তুমি বরবাদ হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহর ﷺ সঙ্গে বাড়াবাড়ি কোরো



না এবং তাঁর কোনো কথার প্রতিউত্তর দিও না এবং তাঁর হতে আলাদা থেকো না। তোমার কোনো কিছুই দরকার হয়ে থাকলে, আমাকে বলবে। আর তোমার প্রতিবেশী তোমার চেয়ে অধিক সুন্দরী এবং রাসূলুল্লাহর ﷺ অধিক প্রিয়—এ যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে।’ তিনি উদ্দেশ্য করেছেন আয়িশাকে রাযি।

সে-সময় আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছিল যে, গাস্‌সানের লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ঘোড়া প্রস্তুত করছে। একদিন আমার সাথি তার পালার দিন নবীজির ﷺ কাছে গেলেন এবং ইশার সময় এসে আমার দরজায় খুব জোরে করাঘাত করে বললেন, ‘তিনি (উমার রাযি.) কি ঘুমিয়েছেন?’ তখন আমি ঘাবড়ে গিয়ে তাঁর কাছে এলাম। তিনি বললেন, ‘সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে।’ আমি বললাম, ‘কী ঘটেছে? গাস্‌সানের লোকেরা কি এসে গেছে?’ তিনি বললেন, ‘না, বরং তার চেয়েও বড় ঘটনা ও বিরাট ব্যাপার! রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীদের তালাক দিয়েছেন।’

উমার রাযি. বললেন, ‘তা হলে তো হাফসার সর্বনাশ হয়েছে এবং সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমার ধারণা হচ্ছিল, এমন কিছু ঘটনা ঘটতে পারে। আমি জামা পরে বেরিয়ে এসে নবীজির ﷺ সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করলাম। সালাত শেষে নবীজি ﷺ তাঁর কোঠায় প্রবেশ করে একাকী বসে থাকলেন। তখন আমি হাফসার রাযি. কাছে গিয়ে দেখি, সে কাঁদছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘কাঁদছ কেন? আমি কি তোমাকে আগেই সতর্ক করিনি? রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তোমাদেরকে তালাক দিয়েছেন?’ সে বলল, ‘আমি জানি না। তিনি তাঁর ঘরে আছেন।’ আমি বের হয়ে মিস্বরের কাছে এলাম; দেখি যে, লোকজন মিস্বরের চারপাশ জুড়ে বসে আছেন এবং কেউ কেউ কাঁদছেন। আমি তাঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ বসলাম। আমার আশঙ্কা বেড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে-ঘরে ছিলেন, আমি সে-ঘরে গেলাম। আমি তাঁর এক কালো গোলামকে বললাম, ‘উমারের জন্য অনুমতি গ্রহণ কর।’ সে প্রবেশ করে নবীজির ﷺ সাথে আলাপ করে বেরিয়ে এসে বলল, ‘আমি আপনার কথা তাঁর কাছে উল্লেখ করেছি, কিন্তু তিনি নীরব রইলেন।’ আমি ফিরে এলাম এবং মিস্বরের পাশে-বসা লোকদের কাছে গিয়ে বসে পড়লাম।

কিছুক্ষণ পর আমার আবার আশঙ্কা প্রবল হল। তাই আমি আবার এসে গোলামকে বললাম (উমারের জন্য অনুমতি গ্রহণ কর), এবারও সে আগের মতোই বলল। তারপর যখন আমি ফিরে আসছিলাম, গোলাম আমাকে ডেকে বলল,



‘রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন।’ তখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে দেখি, তিনি খেজুরের পাতায় তৈরি ছোবড়া-ভর্তি একটি চামড়ার বালিশে হেলান দিয়ে খালি চাটাইয়ের উপর কাত হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর শরীর ও চাটাই এর মাঝখানে কোন ফরাশ (বিছানা) ছিলো না। ফলে তাঁর শরীরের পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে।

আমি তাঁকে সালাম করলাম এবং দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনি কি আপনার সহধর্মিণীদেরকে তালাক দিয়েছেন?’ তখন তিনি আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন এবং বললেন, ‘না।’ তারপর আমি (থমথমে ভাব কাটিয়ে) অনুকূল ভাব সৃষ্টির জন্য দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম, ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ, দেখুন, আমরা কুরাইশ গোত্রের লোকেরা নারীদের উপর কর্তৃত্ব করতাম। তারপর আমরা এমন এক সম্প্রদায়ে এলাম, যাদের উপর তাদের নারীরা কর্তৃত্ব করছে।’ তিনি এ-ব্যাপারে আলোচনায় মুচকি হাসলেন। তারপর আমি বললাম, ‘আপনি হয়তো লক্ষ্য করছেন যে, আমি হাফসার ঘরে গিয়েছি এবং তাকে বলেছি, তোমাকে এ-কথা যেন ধোঁকায় না ফেলে যে, তোমার প্রতিবেশিনী (সতীন) তোমার চেয়ে অধিক আকর্ষণীয় এবং নবীজির ﷺ অধিক প্রিয়’ (এ-কথা দ্বারা তিনি আয়িশাকে রাযি. বুঝিয়েছেন।)। নবীজি ﷺ আবার মুচকি হাসলেন।

তাঁকে একা দেখে আমি বসে পড়লাম। তারপর আমি তাঁর ﷺ ঘরের ভিতর এদিক-সেদিক দেখলাম। কিন্তু তাঁর ﷺ ঘরে তিনটি কাঁচা চামড়া ছাড়া দেখার মতো আর কিছুই পেলাম না; তখন আমি আরম্ভ করলাম, ‘আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আপনার উম্মাতকে পার্থিব সচ্ছলতা দান করেন। কেননা, পারস্য ও রোমের অধিবাসীদেরকে সচ্ছলতা দান করা হয়েছে এবং তাদেরকে পার্থিব অনেক প্রাচুর্য দেওয়া হয়েছে, অথচ তারা আল্লাহর ইবাদত করে না।’ তিনি ﷺ তখন হেলান দিয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, ‘ইবনে খাত্তাব, তোমার কি এতে সন্দেহ রয়েছে যে, তারা তো এমন এক জাতি, যাদেরকে তাদের ভালো কাজের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে।’ আমি আরম্ভ করলাম, ‘আল্লাহর রাসূল, আমার জন্য ক্ষমার দুআ করুন।’ হাফসা রাযি. আয়িশার রাযি.-এর কাছে এ-কথা প্রকাশ করার কারণেই নবীজি ﷺ সহধর্মিণীদের হতে আলাদা হয়েছিলেন। রাসূল ﷺ এক মাস তাদের কাছে না যাওয়ার শপথ করেছিলেন। আল্লাহ তাঁকে এ থেকে বিরত হতে বলার পর তিনি শেষে এ-শপথ

থেকে ফিরে এলেন।” ১৭১

আনাস ইবনে মালিক রাযি. বলেন, “রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের ব্যাপারে শপথ (ইলা) নিলেন এবং ঊনত্রিশ দিন তাদের থেকে দূরে এক ঘরে থাকলেন। তারপর তাঁর স্ত্রীদের কাছে ফিরে গেলেন। কেউ একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনি এক মাসের শপথ নিয়েছিলেন।’ তিনি ﷺ জবাব দিলেন, “এক মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।” ১৭২

স্ত্রীকে ছেড়ে পৃথক থাকা স্ত্রীর জন্য বেশ বড় মানসিক শাস্তি। তবে এ-পৃথক থাকার বিভিন্ন পর্যায় থাকে। এটি হতে পারে, একই বিছানায় দুজনেই ঘুমাচ্ছে, কিন্তু স্বামী শারীরিক মিলন থেকে দূরে থাকছে, যা স্ত্রীর জন্য কষ্টকর; আবার হতে পারে, স্বামী বাড়ি ছেড়েই আলাদা থাকছে।

উপরোক্ত হাদীসের কিছু শিক্ষণীয় দিক—

- স্ত্রীর সাথে প্রত্যেকের ধৈর্য ধারণ করা উচিত। আল্লাহর অধিকার সম্পর্কিত কোনো বিষয় না হলে সে-ক্ষেত্রে তাদের কথার রূঢ়তা বা আচরণের ভুল ক্ষমা করা উচিত।
- নারীদের অত্যধিক চাপে রাখা নিন্দনীয় বিষয়। নবীজি ﷺ স্ত্রীদের জন্য নিজের গোত্রের আচরণ ত্যাগ করে আনসারদের আচরণকে মেনে নিয়েছিলেন।
- কোনো ব্যক্তি তার বন্ধুকে মানসিক অশান্তিতে পেলে তার মন ভালো করতে চেষ্টা করা উচিত। যেমন উমার রাযি. রাসূলের ﷺ ক্ষেত্রে বলেছিলেন, “আমি এমন কিছু বলব, যা শুনে নবীজি হাসবেন।” ১৭৩

## উপগম্যতার

নবীজি ﷺ এবং তাঁর স্ত্রীগণ পরিবারে একে অপরের সাথে সর্বোত্তম আচরণ বজায় রাখতেন। পরিবারে তাদের সবার আচরণ এবং নৈতিকতা উম্মাহর জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। নবীজি ﷺ সব সময় চেষ্টা করতেন তাঁর প্রতিটি ভূমিকায় ন্যায়ানুগ আচরণ

[১৭১] বুখারী (২৪৬৮) ও মুসলিম (১৪৭৯)।

[১৭২] বুখারী (১৯১১)।

[১৭৩] ফাতহুল বারী (৯/২৯১)।



করার। এমনকি পারিবারিক জটিলতার মুহূর্তগুলোতেও তিনি যথাযথভাবে একজন আদর্শ স্বামীর ভূমিকা পালন করেছেন।

প্রতিটি মুসলিমের উচিত রাসূলকে ﷺ অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা। স্ত্রীর সাথে কথা বলায় ও আচরণে ধৈর্য, শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালোবাসা ও সহনশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করা। এ-ক্ষেত্রে আমাদের সফলতা বা ব্যর্থতা আমাদের আখলাক ও ঈমানের প্রকৃত অবস্থাকেই তুলে ধরবে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

সন্তানদের সাথে যেমন ছিলেন নবীজি ﷺ

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের সাথে ব্যবহারে ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় ছিলেন মানুষের মাঝে সর্বোত্তম। সন্তানদের সাথে ব্যবহারে এটি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। তাদের দেখাশোনা ও লালনপালনে তিনি ছিলেন যত্নবান। শিশুদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্পর্ক ছিল মমতাময় ও ভালোবাসাপূর্ণ। নবীজি ﷺ ইসলামী নীতির আলোকে তাঁর নিজের সন্তান ও নাতি-নাতনিদের বড় করে তুলতেন। তাদের বিয়ের পরও তাদের খেয়াল রাখতেন। তিনি ﷺ সন্তানদের দুনিয়াবি প্রয়োজন পূরণ করেই শুধু ক্ষান্ত হননি, বরং তাদের আত্মিক প্রয়োজন পূরণেও তিনি ছিলেন যত্নবান। ব্যবহারের সময় নিজের সন্তান, সৎসন্তান বা অন্য মুসলিমের সন্তানের সাথে তাঁর ব্যবহারে কোনো ভিন্নতা ছিল না। সবার সাথেই তাঁর আচরণ ছিল ভালোবাসা ও মমতাপূর্ণ এবং তাদের গড়ে তোলায় তিনি ছিলেন সদা-তৎপর।

নবীজি ﷺ শিশুদের আনন্দ ও কষ্টে মিশে যাবার চেষ্টা করতেন। তিনি শিশুদের ভালোবাসতেন, তাদের সাথে খেলতেন, কৌতুক করতেন, মমতাভরে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। রাস্তায় পাশ দিয়ে গেলে তিনি তাদের নিজের বাহনে উঠিয়ে নিতেন।

নবীজি মুহাম্মদ ﷺ শিশুদের প্রতি সব সময় ভালোবাসা প্রকাশ করতেন। তারা যেন মনে কষ্ট না পায়, সেজন্য তিনি ﷺ সতর্ক থাকতেন। জাহিলিয়াহ থেকে ইসলাম-গ্রহণ-করা কিছু মানুষ তাঁর এ-রকম আচরণ দেখে অবাক হতো। তাদেরকে তিনি ﷺ বলতেন, “যে অন্যদের প্রতি দয়ালু না, সে নিজেও অন্যের দয়া পায় না।”

আজ শিশু-মনোবিজ্ঞানীরা শিশুদের সাথে নবীজির ﷺ আচরণের মাহাত্ম্য স্বীকার করে। শিশুদের সাথে আচরণে নবীজির মূলনীতি স্থান-কাল-জাতির ঊর্ধ্বে। বহু শতাব্দী



পর আজও তাঁর শিক্ষা সবার জন্য সমান উপযোগী। সমাজের এই প্রস্ফুটিত মুখগুলোর সাথে তিনি সেভাবেই আচরণ করতেন, যেন এই মুখগুলো পরবর্তীতে পুরো সমাজের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যত বয়ে আনতে পারে।

## আল্লাহ নবীজিকে ﷺ অনেক সন্তান দান করেছিলেন

রাসূলের ﷺ তিন ছেলে ছিল : কাসিম, আবদুল্লাহ এবং ইবরাহীম। অনেকে ভুল করে তৈয়ব ও তাহির নামে তাঁর আলাদা ছেলে আছে ভেবে বসে। মূলত এ-দুই নাম আবদুল্লাহরই উপনাম ছিল। এই তিনজনই শিশুকালে ইন্তেকাল করেছিল।

দুই বছর কয়েক মাস বয়সে কাসিম মক্কায় মারা যান। এ-কারণে নবীজিকে ﷺ আবুল কাসিম (আল-কাসিমের বাবা) উপনামে ডাকা হতো। কাসিমের মা ছিলেন খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ।

খাদিজার ঔরসে আবদুল্লাহর জন্ম হয়। রাসূলের ﷺ নবুওয়্যাত লাভের কিছু কাল পরে তিনিও মক্কায় ইন্তেকাল করেন।

ইবরাহীমের মা ছিলেন মারিয়া আল-কিবতিয়া। তিনি মদীনা় হিজরী অষ্টম বছরের জিলহজ্জ মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী দশম বছরে তিনি মাত্র ১৭ বা ১৮ মাস বয়সে ইন্তেকাল করেন।

নবীজির ﷺ চারজন মেয়ে ছিল : যায়নাব, রুকাইয়া, ফাতিমা এবং উম্মে কুলসুম। তাদের সবার জন্ম খাদিজার ঔরসে।

তাঁর প্রথম কন্যা যায়নাব এবং তিনি আবুল আস ইবনে আর-রাবীকে বিয়ে করেন। রুকাইয়া তাঁর দ্বিতীয় কন্যা, উসমান ইবনে আফফানের সাথে তার বিয়ে হয়। উম্মে কুলসুম তাঁর তৃতীয় কন্যা; রুকাইয়ার মৃত্যুর পর উসমান ইবনে আফফান তাকে বিয়ে করেন। সর্বকনিষ্ঠ কন্যা ফাতিমা, তিনি নবীজির ﷺ সবচেয়ে প্রিয় কন্যা ছিলেন; নবীজির ﷺ একচল্লিশ বছর বয়সে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর ﷺ মৃত্যুর মাত্র ছয় মাস পর তিনিও ইন্তেকাল করেন; আলী ইবনে আবু তালিবের সাথে তার বিয়ে হয়।

## নবীজি ﷺ সন্তানদের মূন্দের অর্থবহ নাম রাখতেন

আমরা তাঁর সন্তানদের নামের দিকে খেয়াল করলে দেখতে পাই, সবগুলোই অনেক সুন্দর নাম ছিল। তিনি ﷺ সব সময় সুন্দর অর্থবহ নাম রাখার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন এবং মন্দ অর্থের নাম পেলে তা বদলে নতুন নাম দিতেন।

সুফিয়ান আস-সাওরী রাহ. বলেন, “পিতার ওপর সন্তানের অধিকার হলো, তিনি তার জন্য সুন্দর নাম ঠিক করবেন, প্রাপ্তবয়স্ক হলে বিয়ে দেবেন, হজ্জ করার জন্য সম্পদ দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তাঁকে ভালো ব্যবহার ও আদব শিক্ষা দেবেন।” ১৭৪

## জন্মের দিনেই সন্তানদের নাম ঠিক করতেন

আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন, “আজ রাতে আমার এক ছেলের জন্ম হয়েছে। আমি তার নাম আমার পিতা ইবরাহীমের নামে রাখলাম।” ১৭৫

## সন্তানদের সাথে আচরণের ব্যাপারে নবীজির ﷺ শিক্ষা

নবীজি ﷺ তাঁর মেয়েদের অনেক ভালোবাসতেন। তিনি তাদের ব্যাপারে অনেক খুশি ছিলেন এবং আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাতেন। তাদের যথার্থ বেড়ে ওঠার ব্যাপারে তিনি খেয়াল রাখতেন।

নবীজি ﷺ বলেন, “কাউকে যদি মেয়ে সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করা হয় এবং সে যদি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে, তবে তারা জাহান্নাম থেকে তার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে।” ১৭৬

এখানে পরীক্ষার অর্থ হলো, আল্লাহ দেখবেন—সে মেয়েদের সাথে ভালো ব্যবহার করে কি না! যদি তাতে সে সফল হয়, তবে জাহান্নাম থেকে সে দূরে থাকবে। এর কারণ হলো, প্রকৃতিগতভাবেই মেয়েরা দুর্বল ও ভঙ্গুর প্রকৃতির হয়ে থাকে, তাই

[১৭৪] আল-ইয়্যালে (১৭১) ইবনে আবিদ-দুনইয়া।

[১৭৫] মুসলিম (২৩১৫)।

[১৭৬] বুখারী (৫৯৯৫) ও মুসলিম (২৬২৯)।



তাদের প্রতি বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

## তাঁর কন্যাদের সর্বোত্তম মানুষদের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন

নবীজি ﷺ কুরাইশ গোত্রের আবুল-আস ইবনে আর-রাবীর সাথে তাঁর মেয়ে যায়নাবের বিয়ে দেন। আবুল-আস তাঁর খালা হালা বিনত খুওয়াইলিদের ছেলে ছিলেন এবং তিনি মক্কায় তার সম্পদ, ব্যবসা ও বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। যায়নাব ইসলাম গ্রহণ করলেও তার স্বামী কাফের অবস্থায় থেকে যায়। একসময় নবীজি ﷺ মদীনায় হিজরত করলেন, কিন্তু তিনি মক্কায় তার স্বামীর সাথে থেকে গেলেন। পরে কুরাইশদের সাথে বদরের যুদ্ধে আবুল-আস ইবনে আর-রাবী মুসলমানদের হাতে বন্দি হন।

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “মক্কাবাসীরা (বদরের) বন্দিদের জন্য মুক্তিপণ পাঠাতে শুরু করল। আবুল-আসের মুক্তিপণ হিসেবে যায়নাব কিছু টাকা ও একটি গলার হার পাঠালেন। হারটি তার বিয়ের সময় তার মা খাদিজা রাযি. তাকে উপহার দিয়েছিলেন। নবীজি ﷺ হারটি দেখে বেশ কষ্ট পেলেন। তিনি বললেন, “তোমরা যদি মনে কর, তার বন্দিকে ছেড়ে দেওয়া যায় এবং তার (যায়নাবের) সম্পদগুলো ফিরিয়ে দেওয়া যায় (তবে তা-ই করো)।” তারা রাজি হলেন এবং নবীজি ﷺ আবুল-আসের কাছে ওয়াদা নিলেন যে, তিনি ফিরে যায়নাবকে মদীনায় পাঠিয়ে দেবেন। তিনি ﷺ জায়িদ ইবনে হারিস ও একজন আনসারকে পাঠানোর সময় বললেন, “বাতনে ইয়াজাজ নামের এক জায়গায় যায়নাবের জন্য অপেক্ষা করো, তারপর তাকে সাথে নিয়ে এখানে ফিরে এসো।” ১৭৭

নবীজি ﷺ আবুল-আসের প্রশংসা করে বলেন, “সে আমার সাথে কথা বলার সময় সত্য বলেছে এবং আমাকে দেওয়া তার ওয়াদা পূর্ণ করেছে।” ১৭৮ তিনি তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। যায়নাবকে অনেক ভালোবাসা সত্ত্বেও তিনি তাকে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন।

নবীজি ﷺ রুকাইয়্যার সাথে উসমান ইবনে আফফানের রাযি. বিয়ে দেন।

[১৭৭] আবু দাউদ (২৬৯২)।

[১৭৮] বুখারী (৩১১০) ও মুসলিম (২৪৪৯)।

তার অন্যতম গুণ ছিল লজ্জাশীলতা। তাকে নবীজি ﷺ অনেক শ্রদ্ধা করতেন এবং ভালোবাসতেন। তিনি ﷺ তাকে জান্নাতের সুসংবাদও দিয়েছিলেন। এমনকি রুকাইয়্যার মৃত্যুর পর নবীজি ﷺ তাঁর আরেক মেয়ে উম্মে কুলসুমের সাথে উসমানের বিয়ে দেন। তিনিও উসমানের জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেন।

আলী ইবনে আবু তালিব রাযি. তরুণদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। নবীজি ﷺ তার সাথে তাঁর মেয়ে ফাতিমার বিয়ে দিয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকেই আলী রাযি. নবীজির ﷺ বাড়িতে থাকতেন; নবুওয়্যাত লাভের সময় তিনি তাঁর বাড়িতে ছিলেন এবং নবুওয়্যাত লাভের পরও তিনি নবীজির ﷺ সাথে ছিলেন। নবীজি ﷺ তাকে খুব পছন্দ করতেন। নিজের মেয়ের সাথে তার বিয়ে দিয়েছেন এবং ইসলামের খেদমতের কারণে তাকে জান্নাতের সুসংবাদও দিয়েছেন।

### বিয়ে দেওয়ার জগয় তাঁর মেয়েদের দ্বাংদ্বং জিঙেঙ করতেন

আতা ইবনে রাবাহ রাহ. থেকে বর্ণিত, যখন আলী রাযি. ফাতিমাকে বিয়ে করার ব্যাপারে নবীজিকে ﷺ প্রস্তাব দিলেন, তখন তিনি ﷺ ফাতিমাকে বললেন, “আলি তোমার কথা বলেছে।” ফাতিমা নীরব থাকলেন (সম্মতি দিলেন)। এরপর নবীজি ﷺ তার সাথে আলীর বিয়ে দিলেন।<sup>১৭৯</sup>

ফাতিমার নীরবতাই ছিল বিয়েতে তার সম্মতি। এ-ব্যাপারে নবীজি ﷺ বলেন, “কুমারী মেয়ে তার সম্মতি না দিলে তাকে বিয়ে দেওয়া উচিত নয়।” তাঁকে জিঙেঙ করা হলো, “কীভাবে সে সম্মতি দেবে?” তিনি ﷺ উত্তর দিলেন, “তার নীরবতাই তার সম্মতি।”<sup>১৮০</sup>

মূলত কন্যাসন্তান পিতার কাছে একধরনের আমানত। তার অসম্মতিতে বিয়ে দেওয়া সে-আমানতের খেয়ানত এবং এটা নিষিদ্ধ।

[১৭৯] আত-তাবাকাত গ্রন্থে ইবনে সা'দ (২০/৮)।

[১৮০] বুখারী (৫১৩৬) ও মুসলিম (১৪১৯)।



## তাঁর কন্যাদের বিয়েতে মোহরানার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতেন না

নবীজি ﷺ মেয়েদের বিয়েতে খুব বেশি মোহরানা নির্ধারণ করতেন না। ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, আলি রাযি. বলেন, “আমি ফাতিমাকে বিয়ে করলাম। আমাকে নবীজি ﷺ বললেন, ‘তাকে কিছু দাও।’ আমি বললাম, ‘আমার তো কিছুই নেই।’ তখন নবীজি ﷺ বললেন, ‘তোমার ‘হুতামি’ বর্মটা কোথায়?’ আমি বললাম, ‘আমার সাথে আছে।’ তিনি তাকে সেটিই দিতে বললেন।” ১৮১

ইবনে আসির রাহ. বলেন, “হুতামি বর্ম হুতামা ইবনে মুহারিব নামের এক গোত্রে তৈরি হতো। কিংবা এর অর্থ শব্দগতভাবেও হতে পারে—অর্থাৎ, এটি তরবারিকে ভেঙে ফেলে।” ১৮২

এই সামান্য বর্মটিই রাসূলুল্লাহর ﷺ কন্যার বিয়ের মোহরানা ছিল; যিনি হবেন জান্নাতি নারীদের প্রধান।

বর্তমানে মোহরানা অত্যধিক বেশি করা প্রথায় পরিণত হয়েছে। অথচ মোহরানা যদি কনের সম্মানের নীতিনির্ধারনী হতো, তা হলে নবীজি ﷺ অবশ্যই তা নিজের মেয়ের জন্য সবচেয়ে বেশি নির্ধারণ করতেন।

## বিয়ের পর মেয়ের নতুন বাগস্থানের জন্য উপহার পাঠাতেন

আলি রাযি. থেকে বর্ণিত, যখন নবীজি ﷺ ফাতিমাকে তার সাথে বিয়ে দিলেন, তখন তিনি তার সঙ্গে একটি জামা, খেজুর ছোবড়াভরা চামড়ার একটি বালিশ, দুটো যাঁতা এবং দুটো পাত্র দিয়েছিলেন। ১৮৩

এ-সব উদাহরণ থেকে বিয়েকে সহজ করার শিক্ষা পাই আমরা। বিয়ের প্রস্তুতি হতে হবে প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী। কনে কিংবা বর কারও উপরই এমন বোঝা চাপানো উচিত নয়, যা তার জন্য জুলম হয়ে দাঁড়াবে।

[১৮১] আবু দাউদ (২১২৫) ও নাসাঈ (৩৩৭৫)।

[১৮২] আন-নিহায়াহ (৯৯৪১)।

[১৮৩] আহমদ (৮২১)।

নবীজি ﷺ তাদেরকে আয়িশার রাযি. ঘরের পেছনে উত্তরদিকে একটি ছোট ঘর উপহার দিয়েছিলেন। আয়িশার রাযি. ঘরের ‘জীবরিলের দরজা’ <sup>১৮৪</sup> - এর দিকে মুখ করে সে-ঘরটি ছিল। তাদের ঘরে একটি ছোট দরজা ছিল, যা দিয়ে রাসূল ﷺ মাঝে মাঝে ঢুকে তাদের সাথে দেখা করতেন।

কনের বাবার উচিত বিয়ের খরচে বরকে সাহায্য করা। কেননা, সচরাচর দেখা যায়, বর কেবলই পড়াশুনা শেষ করেছে বা চাকরিতে ঢুকেছে—যখন বেতন অনেক কম থাকে।

## মেয়েদের জন্য বিয়ে-ভোজের আয়োজন করতেন

বুরাইদা থেকে বর্ণিত, যখন আলী রাযি. নবীজির ﷺ কাছে ফাতিমাকে রাযি. বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন, তখন তিনি ﷺ বললেন, “বিয়েতে অবশ্যই ভোজের আয়োজন থাকতে হবে।” তখন সাদ রাযি. বললেন যে, তিনি একটি ভেড়া আনবেন; অন্য আরেক সাহাবী বললেন, তিনি অমুক পরিমাণ গম আনবেন।” <sup>১৮৫</sup>

নবীজির ﷺ সুনাত ছিল বিয়ের পরপরই বিয়ের ভোজের আয়োজন করা। তবে এটি বিয়ের আগে, বিয়ের সময় বা বিয়ের পরেও করা যেতে পারে।

## বিয়ের পরও তাঁর কন্যাদের যত্ন নিতেন

নবীজি ﷺ বিয়ের পরও তাঁর কন্যাদের যত্ন নিতেন। কোনো কিছুতেই তিনি তাদের ব্যাপারে অমনোযোগী হতেন না, তাঁর কঠিনতম সময়েও তিনি তাদের খোঁজখবর নিতে ভুলে যেতেন না। বদরের যুদ্ধে বের হওয়ার সময় তাঁর মেয়ে রুকাইয়্যা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নবীজি ﷺ উসমান ইবনে আফফানকে রাযি. রুকাইয়্যার সেবার জন্য মদীনায়ে রেখে গেলেন। শুধু তা-ই নয়, যুদ্ধের গনিমতের একটি অংশও তাকে দিলেন এবং

[১৮৪] মসজিদে নববীর পূর্বদিকে একটি দরজা রয়েছে যেটিকে বাবে জিবরীল বা জিবরীলের দরজা বলা হয়। এ দরজা দিয়ে রাসূল ﷺ মসজিদে প্রবেশ করতেন। খন্দকের যুদ্ধের পর জিবরীল (আঃ) এ দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং রাসূল ﷺ কে ইহুদী গোত্র বনু কুরায়যার উপর অবরোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন (বুখারী : ৪১১৭)। সে কারণে একে ‘বাবে জিবরীল’ বলা হয়। - সম্পাদক

[১৮৫] আহমদ (২২৫২৬)।



অন্যদের সমপরিমাণ যুদ্ধের সাওয়াবও তিনি পাবেন বলে আশ্বস্ত করলেন।

উসমান যুদ্ধে না যাওয়ার ব্যাপারে কেউ একজন সমালোচনা করলে তার জবাবে ইবনে উমার রাযি. বললেন, “বদর যুদ্ধে তার অনুপস্থিতির কারণ ছিল তার স্ত্রী, আল্লাহর রাসূলের   কন্যা, অসুস্থ ছিলেন। এ-কারণে নবীজি   তাকে বলেছিলেন, ‘তোমার জন্যও বদর যুদ্ধের প্রত্যেকের সমপরিমাণ সাওয়াব ও গনিমতের অংশ রয়েছে।’” ১৮৬

## মেয়ে ও জামাতার মনোমালিন্যে হস্তক্ষেপ করতেন না

সাহল ইবনে সাদ থেকে বর্ণিত, নবীজি   ফাতিমার রাযি. বাড়িতে গেলেন এবং তিনি সেখানে আলিকে খুঁজে পেলেন না। তখন তিনি ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার চাচাতো ভাই   কোথায়?” তিনি উত্তর দিলেন, “আমাদের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছিল। তাই দুপুরে না ঘুমিয়ে তিনি রেগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন।” রাসূল   এক লোককে খুঁজতে বললেন। লোকটি এসে জানাল, আলি রাযি. মসজিদে ঘুমাচ্ছেন। তিনি   তার কাছে গেলেন এবং তাঁর জামার কিছু ধুলা তার ওপর পড়ল। তখন তিনি ধুলো ঝেড়ে দিতে দিতে তাকে বললেন, “ওঠো, আবু তুরাব  !” ১৮৭

এখানে লক্ষণীয় যে, নবীজি   ফাতিমাকে তাদের মধ্যে বিবাদ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করেননি। বরং তিনি আলির রাযি. কাছে গিয়ে তাকে খুশি করার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাকে মজা করে “আবু তুরাব” নামে ডেকে তার মন ভালো করার চেষ্টা করেছেন। তিনি এখানে ফাতিমাকে রাযি. রাগানোর ব্যাপারে কিছুই বললেন না—যদিও ফাতিমা তাঁর অনেক আদরের কন্যা ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে এর বিপরীত চিত্র দেখা যায়। মেয়ের পরিবারে সমস্যা তৈরি হলে অনেক বাবা-মাই বরং তা আরও উসকে দেয়।

ইবনে বাত্তাল রাহ. বলেন, “সবচেয়ে ভালো মানুষদেরও তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সমস্যা দেখা দিতে পারে; কারণ, রাগ মানবপ্রকৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এমনকি রেগে গিয়ে বাড়ি ছেড়েও সে চলে যেতে পারে, এজন্য তাকে দায়ী করা উচিত নয়।

[১৮৬] বুখারী (৩১৩০)।

[১৮৭] আলী রা. আল্লাহর রাসূলের চাচাতো ভাই হওয়া সত্ত্বেও ফাতিমার চাচাতো ভাই বলে সম্বোধনের কারণ হচ্ছে আরবের প্রচলিত একটি সাধারণ পরিভাষা এটি। - ফাতহুল বারি- ২/৪৪২

[১৮৮] আলীর (রা) একটি ডাকনাম, যার অর্থ ধুলোখসরিত মানুষ।

[১৮৯] বুখারী (৪৪১) ও মুসলিম (২৪০৯)।

সম্ভবত এটিও আলীর রাযি. বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার কারণ হতে পারে যে, তিনি আশঙ্কা করছিলেন হয়তো ক্রুদ্ধ অবস্থায় ফাতিমাকে রাযি. তিনি এমন কিছু বলে ফেলবেন, যা ফাতিমার রাযি. মর্যাদার পরিপন্থী। তাই তিনি বাড়ির বাইরে থাকাকেই সমীচীন মনে করলেন—যতক্ষণ না দুজনে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন।” ১১০

বিবাদের উত্তাপ আরও বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে স্বামীর উচিত ঘর ছেড়ে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে চলে যাওয়া। এতে করে দুজনেই শান্ত হওয়া এবং নিজেদের ভুল সম্পর্কে চিন্তা করার সময় পাবে।

অন্যদিকে ফাতিমা বাড়ি ছেড়ে যাননি, বরং বাড়িতেই থেকেছেন। তিনিও যদি বাড়ি ছেড়ে নিজের বাবার বাসায় চলে যেতেন, তা হলে সমস্যা সমাধান হওয়ার কোনো পথ তো থাকতই না, বরং বাড়ত। কেননা, নিজের বাড়িতে স্বামী একসময় ফিরে আসবে, এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু বিবাদের পর স্ত্রীকে তার বাবার বাসা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে স্বামী স্বাচ্ছন্দ্যবোধ নাও করতে পারেন।

## কন্যাদের কেউ তাঁর কাছে বেড়াতে এলে স্বাগত জানাতেন

আয়িশা রাযি. বলেন, “যখন ফাতিমা নবীজির ﷺ বাসায় বেড়াতে আসতেন, তিনি ﷺ উঠে দাঁড়িয়ে তাকে চুমো দিতেন এবং তাঁর জায়গায় তাকে বসতে দিতেন। আর যখন নবীজি ﷺ ফাতিমাকে দেখতে যেতেন, ফাতিমা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে চুমো দিতেন এবং তার জায়গায় তাঁকে বসতে দিতেন।” ১১১

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, ফাতিমা রাযি. একদিন নবীজির ﷺ মতো করে হেঁটে আসছিল। তাকে দেখে নবীজি ﷺ বললেন, “স্বাগতম, আমার মেয়ে!” তারপর তিনি তাকে তার ডানে বা বামে বসতে দিলেন।” ১১২

এই হাদীস প্রমাণ করে ফাতিমাকে নবীজি ﷺ কতটা ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। সেখানে সে-সব নিষ্ঠুর হৃদয়ের মানুষগুলোর কথা চিন্তা করুন, যারা মনে করে চোখ পাকানো আর রাগ দেখানোর মাধ্যমেই পুরুষত্বের প্রকাশ ঘটানো যায় এবং

[১১০] ফাতহুল বারী (৫৮৮/১০)।

[১১১] আবু দাউদ (৫২১৭) ও তিরমিযী (৩৮৭২)।

[১১২] বুখারী (৩৬২৪) ও মুসলিম (২৪৫০)।



সন্তান পালন করা যায়। এ-সব আচরণে দূরত্ব ছাড়া আর কিছুই বাড়ে না।

## কন্যাদের এমনভাবে বড় করেছেন যেন তারা দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করে

আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল ﷺ ফাতিমার ঘরে গেলেন। কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করলেন না। আলি রাযি. ঘরে এলে ফাতিমা রাযি. তাকে এ-কথা জানালেন। তিনি নবীজির ﷺ কাছে গিয়ে এ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তখন তিনি বললেন, ‘আমি তার দরজায় নকশা-করা পর্দা ঝুলতে দেখেছি। দুনিয়ার চাকচিক্যের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?’

আলি রাযি. ফাতিমার কাছে এসে ঘটনা খুলে বললেন। ফাতিমা রাযি. বললেন, ‘তিনি আমাকে এ-সম্পর্কে তাঁর যা ইচ্ছা তা যেন নির্দেশ দেন।’ তখন নবীজি ﷺ বললেন, ‘অমুক পরিবারের অমুকের নিকট এটি পাঠিয়ে দাও; তাদের প্রয়োজন আছে।’” ১৯৩

ইবনে হাজার রাহ. বলেন, “মুহাম্মাব এবং অন্যরা বলেন, ‘নবীজি ﷺ নিজের ব্যাপারে যা অপছন্দ করতেন, সেটি তাঁর মেয়ের জন্যও অপছন্দ করতেন। ভালো জিনিস তাদের জন্য এ-জীবনে পুরস্কার হলে আখিরাতে তখন সেটার জন্য কোনো পুরস্কার থাকবে না। এ-হাদীসে তিনি ﷺ বোঝাতে চাননি যে, দরজায় পর্দা লাগানো হারাম।’” ১৯৪

## দুনিয়া ও আখিরাতে জর্বোত্তম হওয়ার ব্যাপারে সন্তানদের শেখাওতেন

আলি রাযি. থেকে বর্ণিত, “ফাতিমা রাযি. যাঁতা চালানোর কষ্ট সম্পর্কে একবার অভিযোগ প্রকাশ করলেন। এ-সময় নবীজির ﷺ হাতে কিছু যুদ্ধবন্দি এলো। ফাতিমা রাযি. নবীজির ﷺ কাছে গেলেন। কিন্তু তাঁকে না পেয়ে আয়িশার রাযি. কাছে তার (চাহিদার) কথা বলে এলেন। নবীজি ﷺ যখন ঘরে এলেন, তখন ফাতিমার রাযি. আসা

[১৯৩] বুখারী (২৬১৩) ও আবু দাউদ (৪১৪৯)।

[১৯৪] ফাতহুল বারী (২২৯/৫)।

ও তার চাওয়ার ব্যাপারে আয়িশা রাযি. তাঁকে জানালেন। (আলী রাযি. বলেন) নবীজি ﷺ আমাদের ঘরে এলেন। আমরা তখন বিছানায় শুয়ে ছিলাম। তাঁকে দেখে আমি উঠে বসতে চাইলাম। কিন্তু তিনি বললেন, ‘তোমরা যেভাবে ছিলে, সেভাবেই থাকো।’

এরপর তিনি আমাদের মাঝে এমনভাবে বসে পড়লেন যে, আমি তাঁর দুই পায়ে শীতলতা আমার বুকে অনুভব করলাম। তিনি বললেন, ‘তোমরা যা চেয়েছিলে, আমি কি তার চেয়েও উত্তম জিনিস শিক্ষা দেব না?’ তোমরা যখন ঘুমানোর উদ্দেশে বিছানায় যাবে, তখন চৌত্রিশবার আল্লাহ্ আকবার, তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ পড়ে নেবে। এটি খাদেম অপেক্ষা অনেক উত্তম।” ১৯৫

নবীজি ﷺ তাদের খাদেম দেননি এ-কারণে যে, তাঁর কাছে যা-ই আসত, তা-ই তিনি দান করে দিতেন। তাঁর সন্তানদের জন্য তিনি ﷺ অনুরূপ চাইতেন, যেন তারাও দান করে আখিরাতে পুরস্কার লাভ করে।

এ-ছাড়া এই হাদীস থেকে শেখা যায়, কতটা যত্নের সাথে নবীজি ﷺ তাঁর মেয়ে ও মেয়ে-জামাইকে বোঝাতেন। তিনি ঘরে ঢুকে তাদেরকে উঠতেও বলেননি, বরং বিছানায় তাদের দুজনের মাঝে বসে নরমভাবে বোঝালেন পুরো বিষয়টি। তাদের প্রার্থিত জিনিসের চেয়ে উত্তম ছিল আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ, ধৈর্যধারণ এবং পার্থিব জীবনের ধোঁকায় না পড়া। ১৯৬

আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, ফাতিমা রাযি. নবীজির ﷺ কাছে এসে একজন খাদেম চাইলেন। নবীজি ﷺ তাকে একটি দুআ শেখালেন,

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَّتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

[১৯৫] বুখারী (৩৭০৫) ও মুসলিম (২৭২৭)।

[১৯৬] ফাতহুল বারী (১২৪/১১)।



ফাতিমাকে রাযি. নিজের কাজের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হতে বলতেন

“হে আল্লাহ, সাত আসমান ও জমিনের রব্ব, আরশের রব্ব, আমাদের এবং সব কিছুর রব্ব—যিনি বীজ ও খেজুরের বীজকে দ্বিগুণিত করেন, যিনি তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন নাযিল করেছেন—আমি আপনার কাছেই আশ্রয় চাই সে-সব কিছুর অনিষ্ট থেকে, যা আপনি নির্ধারণ করেছে কপাল ধরে। হে আল্লাহ, আপনিই প্রথম, আপনার পূর্বে কিছুই ছিল না, আপনিই সর্বশেষ, আপনার পরে কিছুই নেই। আপনি মহান উচ্চ, আপনার উ কিছুই নেই। আপনি সব গোপন সম্পর্কে জানেন, আপনার থেকে নিকটবর্তী কিছুই নেই। আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং দরিদ্র থেকে মুক্তি দিন।” ১৯৭

## ফাতিমাকে রাযি. নিজের কাজের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হতে বলতেন

নবীজি ﷺ একবার ফাতিমাকে রাযি. বললেন, “ফাতিমা, জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো। আমি তোমাকে আল্লাহর কাছ থেকে রক্ষা করতে পারব না।”

১৯৮

বুখারীতে এই হাদীস এভাবে এসেছে—“মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমা, আমার সম্পদ থেকে কী চাও বলো, (কিন্তু) আমি তোমাকে আল্লাহর কাছ থেকে বাঁচাতে পারব না।” অর্থাৎ, তোমার বংশ তোমাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না। ১৯৯

## ফাতিমাকে রাযি. তাহাজ্জুদ আদায়ের নির্দেশ দিতেন

আলী ইবনে আবু তালিব রাযি. থেকে বর্ণিত, এক রাতে নবীজি ﷺ ফাতিমা ও তার কাছে এলেন। তিনি ﷺ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা তাহাজ্জুদ পড়ো না?” আলি বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল, আমাদের রূহ আল্লাহর হাতে, তিনি যখন ইচ্ছা করেন, তখন আমরা জেগে উঠি।’

নবীজি ﷺ আমার উত্তর শুনে কিছু না বলে চলে গেলেন। আমি তাঁকে উরুতে

[১৯৭] মুসলিম (২৭১৩)।

[১৯৮] বুখারী (২৭৫৩) ও মুসলিম (২০৪)।

[১৯৯] মুসলিম গ্রন্থের (৮০/৩) ব্যাখ্যায় নববী (রাহ.)।

আঘাত করে বলতে শুনলাম,

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

“বরং মানুষ বড়ই তর্কপ্রবণ।” (কাহাফ : ৫৪) ২০০

ইবনে হাজর রাহ. বলেন, “ইবনে বাত্তাল বলেন, এ-হাদীস থেকে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা ও এর জন্য রাতে ওঠার গুরুত্ব আমরা জানতে পারি। রাতের এই সালাত এতটা গুরুত্বপূর্ণ, নাহলে ঘুমের সময় এসে নবীজি ﷺ তাদেরকে এভাবে বিরক্ত করতেন না। তিনি সালাতের নির্দেশ দানের ব্যাপারে কুরআনের এই আদেশের বাস্তবায়ন করেছেন—“তোমার পরিবারকে সালাতের নির্দেশ দাও।” (আল কুরআন, ২০: ১৩২) ২০১

ইবনে বাত্তাল রাহ. আরও বলেন, “আলির দ্রুত উত্তর দেওয়া ও অজুহাত দেখে নবীজি ﷺ বিস্ময়ে নিজ উরুতে আঘাত করেছিলেন। তিনি তার উত্তর পছন্দ করেননি; কারণ, একটি দায়িত্বের ব্যাপারে আলী রাযি. তাকদীরকে কারণ হিসেবে দাড়া করিয়েছিলেন, যা কোনো মতেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। তবে তাহাজ্জুদের সালাত যেহেতু নফল বিষয়, তাই তিনি ﷺ কুরআনের আয়াতটি বলে আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেলেন। যদি এটি আবশ্যিক কোনো সালাত হতো, তবে তিনি তাদের সেটা না পড়িয়ে চলে যেতেন না।” ২০২

## কল্যাণের তিনি ﷺ খুশি করার চেষ্টা করতেন

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “ফাতিমা রাযি. একদিন নবীজির ﷺ মতো করে হেঁটে আসছিল। তাকে দেখে নবীজি ﷺ বললেন, “স্বাগতম, আমার মেয়ে!” এরপর তাকে তাঁর ডানে বা বামে বসালেন এবং তার সঙ্গে চুপিচুপি কথা বললেন। তখন ফাতিমা রাযি. কেঁদে দিলেন। আমি তাকে বললাম, ‘কাঁদছ কেন?’ নবী ﷺ পুনরায় চুপিচুপি তার সঙ্গে কথা বললেন। ফাতিমা রাযি. এবার হেসে উঠলেন।

[২০০] বুখারী (১১২৭) ও মুসলিম (৭৭৫)।

[২০১] ফাতহুল বারী (১১/৩)।

[২০২] বুখারী (১১৫৬/৩) ও হাসিয়াত আস-সিন্দি (২০৫/৩) গ্রন্থদ্বয়ের ব্যাখ্যায় ইবনে বাত্তাল।



আমি বললাম, ‘আজকের মতো দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে আনন্দ ও খুশি কখনো একসাথে দেখিনি।’ আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তিনি ﷺ কী বলেছিলেন?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘আমি আল্লাহর রাসূলের ﷺ গোপন কথা প্রকাশ করব না।’

নবীজি ﷺ ইন্তেকাল করার পর আমি তাকে (আবার) জিজ্ঞেস করলাম, ‘তিনি কী বলেছিলেন?’ ফাতিমা রাযি. উত্তর দিলেন, ‘তিনি ﷺ প্রথমবার আমাকে বলেছিলেন, ‘জিবরীল (আ.) প্রতি বছর একবার আমার সঙ্গে কুরআন পাঠ করতেন, এ বছর দু’বার পড়ে শুনিয়েছেন। আমার মনে হয়, আমার বিদায়বেলা উপস্থিত। এরপর আমার পরিবারের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সঙ্গে মিলিত হবে।’ তা শুনে আমি কেঁদেছিলাম। এরপর তিনি ﷺ বললেন, ‘তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, জান্নাতবাসী নারীদের তুমি নেত্রী হবে?’—এ-কথা শুনে আমি হেসেছিলাম।” ২০৩

## নবীজি ﷺ কন্যাদের উপহার দিতেন

আলী ইবনে আবু তালিব রাযি. বলেন, “নবীজি ﷺ আমাকে রেশমের একটি কাপড় দিলেন। আমি সেটা পরে বেরিয়ে এলাম। আমাকে দেখে নবীজি ﷺ বললেন, “আলী, আমি তোমাকে এটি পরার জন্য দিইনি। এটি দিয়ে ফাতিমাদের মাথার ওড়না বানিয়ে দিয়ো।” ২০৪

নববী রাহ. বলেন, “ফাতিমাদের বলার কারণ হলো এর দ্বারা নবীজি ﷺ তাঁর কন্যা ফাতিমা, আলির মা ফাতিমা বিনতে আসাদ এবং হামজার কন্যা ফাতিমার কথা বুঝিয়েছেন।” ২০৫

## কন্যাদের জাহান্নাম দিতেন এবং ধৈর্যধারণের শিক্ষা দিতেন

উসামা ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত, নবীজিকে ﷺ তাঁর এক মেয়ে ডেকে পাঠালেন এই বলে যে, তার ছেলে মৃত্যুশয্যা। এটি শুনে নবীজি ﷺ তাকে সালাম জানিয়ে বার্তা

[২০৩] বুখারী (২৬২৪)।

[২০৪] বুখারী (২৬১৪), মুসলিম (২০৭১) এবং আহমদ (৭১২)।

[২০৫] মুসলিম গ্রন্থের (৫১/১৪) ব্যাখ্যায় নববী (রাহ.)।

পাঠালেন, “আল্লাহ যা কিছু দিয়েছেন, সবই তাঁর; তিনি যা কিছু নিয়ে যান, সে-সবও তো তাঁর। সব কিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে, তাই তাকে ধৈর্যধারণ এবং আল্লাহর কাছে সাওয়াব প্রার্থনা করতে বলো।”

এটি শুনে তাঁর মেয়ে তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে আবার ডেকে পাঠালেন। নবীজি ﷺ উঠে দাঁড়ালেন। তার সাথে সাদ ইবনে উবাদা, মুআয ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কাব, জারিদ ইবনে সাবিত ও অন্যান্যরা ছিলেন। শিশুটিকে তিনি ﷺ তুলে নিলেন এবং বাচ্চাটির গলা দিয়ে খালি পাত্রে পানি ঢালার মতো শব্দ হচ্ছিল। এটি দেখে নবীজির চোখে অশ্রু জমে টলটল করতে লাগল।

সাদ (তাঁর কান্না দেখে) বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল, এটি কী?’ নবীজি ﷺ বললেন, “এটি রহমত, যা আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার অন্তরে দান করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মাঝে দয়ালুদেরকেই কেবল রহমত দেখান।” ২০৬

নববী রাহ. বলেন, “আল্লাহ যা কিছু দিয়েছেন, সবই তাঁর; তিনি যা কিছু নিয়ে যান, সে-সবও তো তাঁর। সব কিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে”—কথাগুলোর দ্বারা তিনি ﷺ তাকে ধৈর্য ধরার ব্যাপারে উৎসাহ দিচ্ছিলেন। এর অর্থ হলো, আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমার নয়। তিনি তাঁর জিনিসই তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়েছেন। তাই কারও হতাশ ও অশান্ত হওয়া উচিত নয় এটি ভেবে যে, তিনি যা ধার দিয়েছিলেন, তা তিনি ফিরিয়ে নিয়েছেন।

“আল্লাহ যা কিছু দিয়েছেন সবই তাঁর”—এর অর্থ হলো, আল্লাহ যা দেন, সবই তাঁর সাম্রাজ্যেরই অংশ। তিনি সেটি নিয়ে যা খুশি তা-ই করতে পারেন।

সাদ (তাঁর কান্না দেখে) বিস্মিত হওয়ার কারণ হলো, তিনি ভেবেছিলেন—যে-কোনো ধরনের কান্না হারাম এবং আল্লাহর নবী ﷺ তা হয়তো ভুলে গিয়েছেন ভেবে তিনি তাকে তা স্মরণ করিয়ে দিলেন। নবীজি ﷺ তখন তাকে বললেন, চোখে পানি চলে আসা হারাম বা অপছন্দনীয় নয়, বরং এটি দয়া ও রহমত থেকে আসে। আর নিষিদ্ধ হলো, কাঁদার সময় জোরে চিৎকার করা।” ২০৭

[২০৬] বুখারী (১২৩৮) ও মুসলিম (৯২৩)।

[২০৭] মুসলিম গ্রন্থের (২২৫/৬) ব্যাখ্যায় নববী (রাহ.)।



## সন্তানের মৃত্যুতে শোকাহত হতেন

যদি কেউ তার সন্তানের মৃত্যুর মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তবে তার মনে রাখা উচিত, নবীজির ﷺ জীবদ্দশাতেই ফাতিমা রাযি. ছাড়া তাঁর সব সন্তান ইন্তেকাল করেন। ফাতিমাও তাঁর ﷺ মৃত্যুর কিছুকাল পরই ইন্তেকাল করেন। তাদের মৃত্যুতে নবীজি ﷺ কষ্ট পেতেন, তাঁর চোখ কান্নায় ভিজে যেত, কিন্তু তারপরও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, এমন কথাই তিনি ﷺ বারবার মুখে উচ্চারণ করতেন।

আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহর ﷺ কন্যা উম্মে কুলসুম মারা যাওয়ার পর তিনি নবীজিকে ﷺ তার কবরের পাশে বসে থাকতে দেখেছিলেন এবং সে-সময় তাঁর চোখ অশ্রুপূর্ণ ছিল।<sup>২০৮</sup> এগুলো আল্লাহর প্রতি হতাশায় বা ক্রোধে কান্না ছিল না, বরং মমতাময়ী পিতার কন্যাবিয়োগের কষ্ট ছিল তাঁর কান্নার কারণ।

আনাস ইবনে মালিক রাযি. আরও বলেন, “আমরা কামার আবু সাইফের ঘরে গেলাম। তার স্ত্রী নবীজির ﷺ পুত্র ইবরাহীমকে দুধপান করাতো। নবীজি ﷺ ইবরাহীমকে কোলে নিয়ে চুমো খেলেন এবং তার ঘ্রাণ নিলেন। পরে ইবরাহীমের মৃত্যুর সময় আমরা তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি ﷺ তখন কাঁদছিলেন।”<sup>২০৯</sup>

এটি দেখে আব্দুর রাহমান ইবন আওফ রাযি. বললেন, ‘আপনিও, আল্লাহর রাসূল!’ শুনে তিনি ﷺ জবাব দিলেন, “ইবনে আওফ, এ তো করুণার কান্না।” এরপর আরেকবার হলো (অর্থাৎ প্রথম কান্নার পর আবার কাঁদলেন)। এরপর তিনি ﷺ বললেন, “চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে, অন্তর কষ্টে মুচড়ে ওঠে, কিন্তু আমরা রব্বকে সন্তুষ্ট করে এমন কথা ছাড়া আর কোনো কথা বলব না। ইবরাহীম, তোমার চলে যাওয়াতে তো আমরা কষ্ট পেয়েছি।”<sup>২১০</sup>

আনাস ইবনে মালিক রাযি. বলেন, “আমি নবীজির ﷺ চেয়ে সন্তানদের সাথে অধিকতর দয়ালু আর কাউকে দেখিনি।”

তিনি আরও বলেন, “মদীনার আওয়ালী নামক জায়গায় ইবরাহীম দুধপান করত। নবীজি ﷺ তাকে দেখতে সে-বাসায় যেতেন। ধোঁয়ায় বাসাটি ভরে থাকত

[২০৮] বুখারী (১২৮৫)।

[২০৯] বুখারী (১২৮৫)।

[২১০] বুখারী (১৩০৩)।

(যেহেতু বাসাটি ছিল একজন কামারের), তাই আমি দ্রুত আগে গিয়ে বলতাম, “আবু সাইফ নবীজি ﷺ আসছেন, থামো!” নবীজি ﷺ তারপর ইবরাহীমকে কোলে নিয়ে চুমো খেতেন, তারপর চলে যেতেন।”



## তৃতীয় অধ্যায়

### নাতিদের সাথে যেমন ছিলেন নবী ﷺ

পরিবারে উষ্ণ ভালোবাসা আর মমতাঘেরা পরিবেশ সন্তানদের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এতে তাদের মাঝে সুন্দর আখলাক ও মহৎ গুণের বিকাশ হয়। নবীজির ﷺ নাতিরা এমনই এক অসাধারণ পরিবেশে তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়েছেন। তাঁর কথা ও ব্যবহার থেকে তারা শিখেছেন মানবতার মহৎ গুণাবলি। ইতিহাসের পাতায় তারা স্মরণীয় হয়ে আছেন তাদের উদারতা ও অবদানের জন্য। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের কাছে দীক্ষিত হয়ে এমন মানুষ গড়ে উঠবে, এমনটা হওয়াই তো স্বাভাবিক।

আল্লাহর নবীর ﷺ সাতজন নাতি-নাতিনি ছিলেন। তারা হলেন—

- হাসান ইবনে আলী : আলি ইবনে আবু তালিব ও ফাতিমার রাযি. প্রথম পুত্র ছিলেন হাসান রাযি.। তার সাথে নবীজির ﷺ অবয়বগত দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি মিল ছিল। ৩ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। নবীজির ﷺ মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল সাত বছর।
- হুসাইন ইবনে আলী : আলি ও ফাতিমার রাযি. দ্বিতীয় পুত্র হুসাইন ৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।
- উম্মে কুলসুম বিনতে আলী : নবীজির ﷺ মৃত্যুর আগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। উম্মার ইবনে খাত্তাব তাকে বিয়ে করেন। যায়দ ইবনে উম্মার ও রুকাইয়্যা নামে তাদের দুই সন্তান হয়। তিনি ও তার পুত্র যায়দ দুজনেই ৭৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।
- যায়নাব বিনতে আলী : নবীজির ﷺ জীবদ্দশায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের সাথে তার বিয়ে হয়। আবদুল্লাহর

- স্ত্রী থাকা অবস্থাতেই তিনি কয়েক সন্তানের জন্ম দেন এবং ইন্তেকাল করেন।  
যায়নাব ও আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের অনেক বংশধর এখনো বেঁচে আছেন।
- আবদুল্লাহ ইবনে উসমান : তিনি রুকাইয়্যার রাযি. এর ছেলে ছিলেন। হাবশায় (ইথিওপিয়া) জন্মগ্রহণ করেন। ছয় বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।
  - উমামা বিনত আল-আস : তিনি (নবীজির ﷺ কন্যা) যায়নাবের মেয়ে ছিলেন। ফাতিমার মৃত্যুর পর আলি রাযি. তাকে বিয়ে করেন; তবে তাদের ঔরসে কোনো সন্তান জন্মলাভ করেনি। আলির মৃত্যুর পর মুগীরা ইবনে নওফেলের সাথে তার বিয়ে হয়। সেখানেও তাদের কোনো সন্তান হয়নি।
  - আলি ইবনে আল-আস : তিনি উমামার সহোদর ভাই। বালেগ হওয়ার আগেই নবীজির ﷺ জীবদশায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

নবীজির ﷺ মেয়ে ফাতিমা দুই ছেলে হাসান ও হুসাইনের মাধ্যমে নবীজির ﷺ বংশধারা এখনো চালু আছে। হাসানের বংশধরদের হাসানী বলা হয় এবং হুসাইনের বংশধরদের হুসাইনী বলা হয়।

নাতি-নাতনিদের সাথে নবীজি ﷺ তাঁর সন্তানদের মতোই মমতা ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতেন।

## বাচ্চাদের তাহনীক করতেন

নবীজির ﷺ স্ত্রী আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “বাচ্চাদের তাঁর ﷺ কাছ আনা হতো। তিনি তাদের জন্য দুআ করতেন এবং তাহনীক করতেন।” <sup>২১</sup>

নববী রাহ. বলেন, “তাহনীক হলো, খেজুর বা এ-রকম কিছু চিবিয়ে শিশুর মুখের তালুতে লাগিয়ে দেওয়া। খেজুর ছাড়াও এটি করা যায়। তবে খেজুর দিয়ে করাই উত্তম; কারণ, এর মিষ্টতা বাচ্চাদের জন্য উপকারী।” <sup>২২</sup>

আধুনিক বিজ্ঞান শিশুর শারীরিক বিকাশে তাহনীকের গুরুত্ব স্বীকার করেছে। এ-সম্পর্কিত গবেষণা বলে, নবজাতক শিশুর তাহনীকে খেজুর বা মিষ্টি-জাতীয় কোনো

[২১] মুসলিম (২৩১৬)।

[২২] মুসলিম গ্রন্থের (১২৪/১৪) ব্যাখ্যায় নববী (রাহ.)।



খাবার ব্যবহার করা উচিত। কারণ, দুটো কারণে নবজাতকের হঠাৎ মৃত্যু হতে পারে— রক্তে ব্লাড সুগার কমে যাওয়ার কারণে অথবা চারপাশের তাপমাত্রা কম থাকার কারণে শরীরের তাপমাত্রা হঠাৎ কমে গেলে। সাধারণত নবজাতকের শরীরে ব্লাড সুগারের মাত্রা কম থাকে, যার ফলে শিশু মায়ের দুধ খেতে চায় না, পেশিতে খিঁচুনি লাগে, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয় বা ত্বক নীলাভ হয়ে ওঠে।

এর প্রতিকার বেশ সহজ; তা হলো, রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ানো—সরাসরি মুখে খেতে দিয়ে অথবা ইনজেকশনের মাধ্যমে। তাহনীর মাধ্যমে এ-কাজটিই করা হয়। তাহনীর মাধ্যমে বাচ্চার মুখ ও জিহবার পেশি সচল হয়, ফলে মায়ের দুধ খাওয়া তার জন্য সহজ হয়।<sup>২৩</sup>

## কোলে নাতি প্রসাব করলে রেগে যেতেন না

লুবাবা বিনতে হারিস থেকে বর্ণিত, “একদিন হাসান ইবনে আলী রাযি. নবীজির ﷺ কোলে বসে প্রসাব করে দিলেন। তিনি নবীকে ﷺ বললেন, ‘আপনার জামা পরিবর্তন করে নিন। আমি ধুয়ে দিচ্ছি।’ তিনি বললেন, ‘কেবল বাচ্চা মেয়ের প্রসাব লাগলে (জামা) ধুয়ে দিতে হয়, কিন্তু বাচ্চা ছেলের প্রসাব হলে সেটার ওপর পানি ছিটিয়ে দিলেই চলে।’”<sup>২৪</sup>

আবু লায়লা বলেন, “আমি নবীজির ﷺ সঙ্গে ছিলাম আর হাসান কিংবা হুসাইন তাঁর বুক বা পেটের ওপর শুয়ে ছিল। আমি দেখলাম, সে প্রসাব করে দিচ্ছে; তাই আমি তাকে নিতে উঠে দাঁড়িলাম। নবীজি ﷺ বললেন, “থাক, তাকে ভয় পাইয়ে দিয়ো না। প্রসাব করা শেষ করতে দাও তাকে।” এরপর তিনি সেটা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেললেন এবং প্রসাব পানির সাথে ধুয়ে চলে গেল।”<sup>২৫</sup>

[২১৩] <http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article,lang=A,id=143055> প্রকাশিত নিবন্ধ থেকে নেওয়া।

[২১৪] আবু দাউদ (৩৭৫) ও ইবনে মাজাহ (৫২২)।

[২১৫] আহমদ (১৮৫৮০)।

## নাতিদের মজজিদে নিয়ে যেতেন

আবু বাকরা রাযি. বলেন, “আমি নবীজিকে ﷺ মিন্বারের উপর দাঁড়ানো দেখলাম। তাঁর পাশেই হাসান ছিল। সে নবীজি ﷺ আর তাঁর সামনের মানুষের মাঝে ছুটোছুটি করছিল। তিনি বললেন, “আমার এই বাচ্চা একদিন নেতৃত্ব দান করবে এবং মুসলিমদের দুটো বিশাল দলের মাঝে সে সমঝোতা ২১৬ করে দেবে।” ২১৭

বুরাইদা ইবন হুসাইব রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর সামনে লাল জামা পরে এসে হাসান ও হুসাইন একজন আরেকজনের ওপর পড়তে লাগল এবং আবার উঠতে লাগল। নবীজি ﷺ মিন্বার থেকে নেমে এসে তাদেরকে কোলে নিয়ে আবার মিন্বারে উঠলেন এবং বললেন, “আল্লাহ সত্য বলেছেন— “তোমাদের সম্পদ ও সন্তান তোমাদের জন্য পরীক্ষা।” (আল কুরআন, ৬৪:১৫) আমি এ দুজনকে দেখে ধৈর্য ধরে রাখতে পারলাম না।” এরপর তিনি তাঁর খুতবার কথায় ফিরে গেলেন। ২১৮

আল্লাহর বাণী—“তোমাদের সম্পদ ও সন্তান তোমাদের জন্য পরীক্ষা”—এর অর্থ হলো, এগুলো মানুষকে আল্লাহর ইবাদাত থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। খুতবা থামিয়ে ভালোবাসাবশত তাদের কোলে তুলে নেওয়া তাঁর জন্য একটি পরীক্ষা ছিল। সন্তানদের মাধ্যমে পিতামাতা বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, এটি ছিল সেগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরের। এ-পরীক্ষা যেন উপরের স্তরে না যায়, তা খেয়াল রাখতে হবে। ২১৯

আবু কাতাদা আল-আনসারী থেকে বর্ণিত, তিনি নবীজিকে ﷺ সালাতে ইমামতি করতে দেখলেন। এ-সময় তাঁর কাঁধে যায়নাবের মেয়ে উমামা বিনতে আবুল আস তাঁর কাঁধে চড়ে ছিল। যখন তিনি ﷺ রুকুতে যেতেন তাকে নামিয়ে রাখতেন, আর সিজদা থেকে উঠে তাকে আবার তুলে নিতেন। ২২০

[২১৬] আলী রা.-এর মৃত্যুর পর কুফাবাসীসহ বিপুলসংখ্যক মানুষ তাঁর হাতে বাইআত হয়। ওদিকে শামবাসীরা মুআবিয়া রা.-এর হাতে বাইআত হয়। হাসান রা.-এর শামবাসীদের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি-সামর্থ্য পুরোপুরিই ছিল। এ সন্ধেও মাস খানেক পরই তিনি মুআবিয়া রা.-এর সঙ্গে আপোস করে নেন এবং খেলাফত থেকে পদত্যাগ করে তাঁর হাতে বাইআত হয়ে যান। - সম্পাদক

[২১৭] বুখারী (২৭১৪)।

[২১৮] আবু দাউদ (১১০৯), তিরমিযী (৩৭৭৪), নাসাঈ (১৪১৩) এবং ইবনে মাজাহ (৩৬০০)।

[২১৯] ফাতহুল বারী (২৫৪/১১)।

[২২০] বুখারী (৫১৬) ও মুসলিম (৫৪৩)।



## সালাতের মধ্যে শিশুদের খেলাধুলা সহ্য করতেন

শাদ্দাদ ইবনে আল-হাদ থেকে বর্ণিত, “নবীজি ﷺ মাগরিব বা ইশার সালাতের জন্য বেরিয়ে এলেন। তাঁর সাথে (কোলে) হাসান বা হুসাইন রাযি. ছিল। তিনি সামনে গিয়ে তাকে রেখে সালাত শুরু করলেন। সালাতে তিনি অনেক লম্বা সিজদা দিলেন। আমি সিজদা থেকে মাথা তুলে দেখলাম, বাচ্চাটি তাঁর পিঠে বসে আছে তাঁর সিজদা করার সময়। আমি আমার মাথা আবার নামিয়ে ফেললাম। সালাত শেষে নবীজিকে ﷺ লোকেরা বলল, ‘আল্লাহর রাসূল, আপনি একটি সিজদা অনেক লম্বা করেছিলেন— আমরা ভেবে বসলাম, কোনো খারাপ কিছু ঘটেছে (হঠাৎ মৃত্যু বা অসুস্থতা) কিংবা আপনার ওপর ওহী এসেছে। নবীজি ﷺ উত্তর দিলেন, “কোনোটাই না, বরং আমার বাচ্চা (নাতি) আমার পিঠে চড়েছিল। তার (খেলা) শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি নড়তে চাচ্ছিলাম না।” ২২১

## হুজান ও হুজাইন তাঁর পিঠে চড়ে রাগ করতেন না

আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, “নবীজির ﷺ সাথে আমরা ইশার সালাত আদায় করছিলাম। তিনি সিজাদায় গেলে হাসান ও হুসাইন তাঁর পিঠের ওপর চড়ে বসছিল। সিজদা থেকে মাথা তোলার সময় আলতো করে তিনি তাদের মাটিতে নামিয়ে দিচ্ছিলেন। এরপর তিনি আবার (সিজাদায়) গেলে আবার তারা পিঠে চড়ে বসছিল। এভাবেই তিনি সালাত শেষ করলেন। এরপর তাদেরকে কোলে নিয়ে বসে ছিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, ‘আল্লাহর রাসূল, আমি তাদের বাসায় রেখে আসছি।’ তখন আকাশে বজ্রপাত হলো। নবীজি ﷺ তাদের বললেন, “তোমরা দুজন মায়ের কাছে যাও।” তাদেরকে বাসায় পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত আকাশে বজ্রপাত হচ্ছিল।” ২২২

আবু বাকরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ সালাত পড়ার সময় সিজদায় গেলে হাসান তাঁর কাঁধে চড়ে বসত। নবীজি ﷺ তাকে আলতো করে নামিয়ে দিতেন, যেন মাটিতে পড়ে না যায়। সে এরকম একাধিকবার করত। সালাত শেষে আমরা তাঁকে

[২২১] নাসাঈ (১১৪১)।

[২২২] আহমদ (১০২৮১)।

জিঞ্জেস করলাম, ‘আল্লাহর রাসূল, আমরা আপনাকে হাসানের সাথে এমন কিছু করতে দেখলাম, যা আগে কখনো দেখিনি।’ নবীজি ﷺ উত্তর দিলেন, “সে এ-জীবনে আমার রায়হান (একধরনের সুগন্ধি গাছ)। আমার এই বাচ্চা একদিন নেতৃত্ব দান করবে এবং মুসলিমদের দুটো বিশাল দলের মাঝে সে সমঝোতা করে দেবে।” ২২৩

নাতিদের নবীজি ﷺ দয়া ও রহমতের মাঝে বড় করেছেন। বাচ্চাদের খাদ্য-পানীয়ের মতো বড়দের যত্ন-ভালোবাসাও প্রয়োজন। বাচ্চার ভারসাম্যপূর্ণ জটিলতামুক্ত ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলায় এ-রকম পরিবেশ অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

## নবীজি ﷺ তাদের অনেক ভালোবাসতেন

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, “আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে বের হলাম; আমরা দুজনেই কোনো কথা বলছিলাম না। আমরা বনু কায়নুকার বাজারে গেলাম এবং ফিরে এলাম। এরপর তিনি ﷺ ফাতিমার বাসায় গেলেন। তিনি ডাকলেন, “লুকা (অর্থ—ছোট শিশু হাসান) এখানে আছে?” আমরা ভেবেছিলাম, সে (ফাতিমা) হাসানকে নিয়ে আছে—গোসল করিয়ে মালা পরে দেওয়ার জন্য। হাসান নবীজির কাছে এলে দুজন একে অপরকে জড়িয়ে ধরল। তিনি ﷺ বললেন, “আল্লাহ, আমি একে ভালোবাসি, আপনিও তাকে ভালোবাসুন এবং যে ব্যক্তি তাকে ভালোবাসে, তাকেও আপনি ভালোবাসুন।” আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, “নবীজির ﷺ এ-কথা বলার পর হাসান ইবনু আলির চেয়ে অন্য কেউ আমার কাছে অধিকতর প্রিয় হয়নি।” ২২৪

নবী রাহ. বলেন, “তারপর হাসান বের হয়ে এসে নবীজিকে ﷺ জড়িয়ে ধরল”—এ থেকে বাচ্চাদের সাথে কোমল হয়ে খেলাধুলা করার শিক্ষা পাওয়া যায়।” ২২৫

## নাতিদের কোলে নিয়ে চুম্বা দিতেন

আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, “নবীজি ﷺ আকরা ইবনে হাবিস আত-তামিমীর

[২২৩] আহমদ (১৯৯৯৪)।

[২২৪] বুখারী (৫৮৮৪) ও মুসলিম (২৪২১)।

[২২৫] মুসলিম (১৯৩/১৫) গ্রন্থের ব্যাখ্যায় নবী (রাহ.)।



সামনে হাসান ইবন আলিকে চুমো খেলেন। আকরা বলল, ‘আমার দশটি সন্তান আছে, আমি কখনো তাদের চুমো দিইনি।’ নবীজি ﷺ তার দিকে তাকিয়ে বলেন, “যার মাঝে রহমত নেই, তাকে রহমত দেখানো হবে না।” ২২৬

এ-হাদীস থেকে বোঝা যায়, বাচ্চাকে চুমো দেওয়া, জড়িয়ে ধরা—এগুলো তাদের প্রতি বাবা-মায়ের রহমতের অংশ। ২২৭

আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, “আমি নবীজিকে ﷺ তাঁর কাঁধে হাসান ইবনে আলিকে নিয়ে থাকতে দেখলাম। সে-সময় তাঁর ওপর হাসানের লাল গাড়িয়ে পড়ছিল।” ২২৮

## নবীজি ﷺ তাদের নিজের কাঁধে চড়াতেন

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ এক কাঁধে হাসান, আরেক কাঁধে হুসাইনকে নিয়ে বাইরে বের হলেন। তাদেরকে চুমো দিলেন। এভাবে লোকদের কাছে পৌঁছলে একজন বলে উঠল, ‘আল্লাহর রাসূল, আপনি তাদের ভালোবাসেন!’ নবীজি ﷺ বললেন, “যে তাদের ভালোবাসে, সে আমাকে ভালোবাসে। যে তাদের ঘৃণা করে, সে আমাকে ঘৃণা করে।” ২২৯

নবীজির ﷺ বাচ্চাদের সাথে যেভাবে সময় কাটাতেন, সেভাবে তাদের সময় দিতে আজ অনেকেই ব্যর্থ। খাদেম, বেবি সিটার বা বয়স্ক মহিলাদের কাছে রেখে অনেকে বাচ্চা বড় করে। এভাবে বাবা-মার ভালোবাসা থেকে শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে।

## নাতিদের বাহুনে উঠিয়ে নিতেন

আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাযি. বলেন, “নবীজি ﷺ দীর্ঘ সফর থেকে ফিরে এলে পরিবারের বাচ্চারা তাঁর কাছে এসে ভিড় জমাত। একবার তিনি ফিরে এলেন, প্রথমেই আমি এলাম। তখন তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসালেন। তারপর ফাতিমার দুই ছেলে

[২২৬] বুখারী (৫৯৯৭) ও মুসলিম (২৩১৮)।

[২২৭] ফাতহুল বারী (৪৩০/১০)।

[২২৮] ইবনে মাজাহ (৬৮৫)।

[২২৯] আহমদ (৯৩৮১) ও ইবনে মাজাহ (১৪৩)।

এলেন, তাদেরকে তাঁর পেছনে বসালেন।” ২৩০

আইয়্যাস ইবনে সালামা থেকে বর্ণিত, তার পিতা বলেন, “নবীজির ﷺ সাথে হাসান ও হসাইন খচ্চরের উপর বসা ছিল আর আমি পথ দেখাচ্ছিলাম। এভাবে আমি তাদের নবীজির ﷺ বাসায় নিয়ে এলাম—তখন তাঁর পেছনে একজন বসা ছিল আর সামনে একজন।” ২৩১

## শিশুদের সাথে খেলাধুলা করতেন

ইয়লা ইবনে মুররা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজির ﷺ সাথে কয়েকজন রাতের খাবারের দাওয়াতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে হসাইনকে খেলতে দেখতে পেলেন। নবীজি ﷺ অন্যদের থেকে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন। হসাইন হাসতে হাসতে দৌড়ে এলো। নবীজি ﷺ তাকে কোলে তুলে নিলেন। তিনি হসাইনের খুতনির নিচে এক হাত রাখলেন আর তার মাথার পেছনে আরেক হাত রেখে চুমো দিলেন। তিনি ﷺ তারপর বললেন, “হসাইন আমার, আমি হসাইনের। যে হসাইনকে ভালোবাসে, আল্লাহ যেন তাকে ভালোবাসেন। হসাইন যেন নিজেই এক জাতি।” ২৩২

মুবারাকপুরী রাহ. বলেন, “হসাইন আমার, আমি হসাইনের”—এর অর্থ হলো, তারা দুজন একে অপরের সাথে অত্যন্ত দৃঢ় ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ।

“হসাইন যেন নিজেই এক জাতি”—এর অর্থ হলো, তার বংশে অনেক গোত্রের জন্ম হবে এবং তার অনেক বংশধর বেঁচে থাকবে। এমনকি বর্তমানেও তার অনেক বংশধর জীবিত।” ২৩৩

## নাতিদের জন্য দূআ করতেন

উসামা ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ তাকে ও হাসানকে তাঁর দুই হাঁটুতে

[২৩০] মুসলিম (২৪২৮)।

[২৩১] মুসলিম (২৪২৩)।

[২৩২] ইবনে মাজাহ (১৪৪) ও তিরমিযী (৩৭৭৫)।

[২৩৩] তুহফাতুল আওয়াযী (১৭৮/১০)।



বসালেন এবং তাদেরকে খুব কাছে নিয়ে বললেন,

اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحُمُهُمَا

“আল্লাহ, তাদের ওপর দয়া করুন, আমি যে তাদের দয়া করি।” ২৩৪

## হাদিয়া পেলে তার একটি অংশ তাদের দিতেন

উপহার পেলে বড়রা তো খুশি হয়, ছোটরা আরও বেশি খুশি হয়। তাই নাতিদের নবীজি ﷺ উপহার দিতেন। আয়িশা রাযি. বলেন, “নাজ্জাশী (ইথিওপিয়ার শাসক) নবীজিকে ﷺ উপহার হিসেবে কিছু গয়না পাঠালেন। সেগুলোর মধ্যে একটি সোনার আংটি ছিল। তিনি একটি লাঠি দিয়ে সেটি তুললেন, যেন তার স্পর্শে না আসে এবং যায়নাবের মেয়ে উমামাকে ডেকে বললেন, “মেয়ে (নাতনী) আমার, তুমি এটা পরো।”

২৩৫

## হারাম থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দিতেন

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, হাসান ইবনে আলি সাদাকার একটি খেজুর নিয়ে মুখে দিলেন। নবীজি ﷺ “খক, খক” শব্দ করে ফেলে দিতে বললেন। তারপর তাকে বললেন, “জানো না, আমরা সাদাকা থেকে কিছু খাই না!” ২৩৬

বড়দের জন্য যা নিষিদ্ধ, সে-ব্যাপারে ছোটদেরও শেখানো অভিভাবকের দায়িত্ব। তাদের ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে শেখানো উচিত। হয়তো প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়ায় কোনো হারাম কাজ করে বসলে তাদের পাপ হবে না। তবে তাদের সে সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। ২৩৭

[২৩৪] বুখারী (৬০০৩)।

[২৩৫] আবু দাউদ (৪২৩৫) ও ইবনে মাজাহ (৩৬৪৪)।

[২৩৬] বুখারী (১৪১৯) ও মুসলিম (১০৬৯)।

[২৩৭] মুসলিম (১৭৫/৭) গ্রন্থের ব্যাখ্যায় নববী (রাহ.) এবং ফাতহুল-বারী (৩৫৫/৩)।

## সন্তান ভীৰুতা ও কৃপণতার কারণ

ইয়ালা আল-আমিরী থেকে বর্ণিত, হাসান ও হুসাইন নবীজির ﷺ দিকে দৌড়ে এলো। তিনি তাদের দুজনকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বলে উঠলেন, “(মানুষের জন্য) সন্তান ভীৰুতা ও কৃপণতার কারণ।” ২৩৮

আস-সিন্দি রাহ. বলেন, “এর অর্থ হলো, সন্তানের জন্য অধিক ভালোবাসার কারণে মানুষ দান করতে কৃপণতা দেখায় এবং তাদের জন্য মৃত্যুকে ভয় পায় এবং ভীৰু হয়।” ২৩৯

## উপগৃহ্য

নবীজি মুহাম্মদ ﷺ নিজের সন্তান ও নাতি-নাতনিদের গভীর ভালোবাসা ও মমতায় বড় করে তুলেছেন, ঈমান ও সংকর্মের ব্যাপারে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি তাদের আখিরাতে ব্যাপারে সতর্ক করেছেন, আখিরাতে জন্য গড়ে তুলেছেন। সন্তানদের প্রতি ভালোবাসার বশবর্তী হয়ে কখনো তিনি তাদের হারামের ব্যাপারে ছাড় দেননি। বরং ছোটবেলা থেকেই ইসলামের বিধিনিষেধ সম্পর্কে তাদের শিক্ষা দিয়েছেন।

সবার সামনে বাচ্চাদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে নবীজি ﷺ কখনোই লজ্জা পেতেন না। নিজের মেয়ে-নাতনিদের কোলে করে আদর করতেন। তৎকালীন আরব-সমাজে এমন দৃষ্টান্ত বিরল ছিল, বরং নবজাতক বা বাচ্চা মেয়েদের কবর দিয়ে মেরে ফেলাই সে-সময়ের প্রথা ছিল।

নবীজির ﷺ সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা ও মমতা আমাদের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। পরিবারের বন্ধন দৃঢ় রাখতে এর কোনো বিকল্প নেই।

[২৩৮] ইবনে মাজাহ (৩৬৫৬)।

[২৩৯] হাসিয়াত আস-সিন্দি (৭২/৭)।



## চতুর্থ অধ্যায়

### আত্মীয়দের সাথে যেমন ছিলেন নবীজি ﷺ

নবীজি ﷺ তাঁর আত্মীয়দের সাথে নম্র ও দয়ালু ছিলেন। তাঁর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়—‘‘তিনি ছিলেন সব থেকে দায়িত্বশীল এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষায় সবচেয়ে তৎপর।’’ ২৪০

ইসলামপূর্ব আরব-সমাজে পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের নিয়ে গোত্র ও গোত্রগত সম্প্রীতি গড়ে উঠত। গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ-দাঙ্গা লেগে থাকত। এ-রকম এক পটভূমিতে উপজাতীয় কুসংস্কার এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের উর্ধ্ব উঠে নবীজি ﷺ ইসলামী শিক্ষার আলোকে পরিবার ও আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে তুলেছেন।

নবীজি ﷺ তার পরিবার, নিকটাত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের ইসলামী মূলনীতি, সত্য ও ন্যায়ের শিক্ষা দিতেন। বর্তমান বিশ্বের সকল সমস্যার মূলে যে-বর্ণবাদ, জাতিগত দ্বন্দ্ব, বৈষম্য ও সামাজিক অবিচার কাজ করছে, নবীজির ﷺ শিক্ষা মেনে সে-সবের মূলে কুঠারাঘাত করা সম্ভব। নবীজির ﷺ সামনে বর্ণ বা গোত্রীয় গর্ব করে কেউ পার পেত না। গোত্র বা বর্ণের সংকীর্ণতার উর্ধ্ব উঠে এক স্রষ্টা ও এক দ্বীন ছিল তাঁর দাওয়াতের মূলনীতি। কুরাইশ-নেতা আবু সুফিয়ান, সমৃদ্ধ ব্যবসায়ী আবু বাকর, ফার্সি অভিবাসী সালমান আল-ফারসি আর আফ্রিকান ক্রীতদাস বিলাল এক কাতারে নেমে ইসলামের কাজ করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের কেউই অপর থেকে বর্ণ, সম্পদ বা বংশের কারণে অতিরিক্ত সম্মান বা অসম্মান কোনোটিই পায়নি।

অজ্ঞতা, গোত্রপ্রীতি আর বর্বরতার বাহক এ-সব আরবদের ইসলামের ছায়াতলে এসে এক সভ্য সুসংগঠিত জাতিতে পরিণত হওয়া লোহা থেকে সোনা হওয়ার মতোই অলৌকিক ছিল। এটি সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায় এবং নবীজির ﷺ প্রাজ্ঞ পথনির্দেশের মাধ্যমে। নবীজির ﷺ নিজ হাতে গড়ে-উঠা মানুষগুলোর মাঝে প্রথম

[২৪০] ‘আব্দুল মুত্তালিব ইবনে রাবি’আহর সনদে মুসলিম (১০৭২)।

সারিতেই ছিলেন তাঁর নিকটাত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ সাহাবীগণ।

## নবীজির ﷺ চাচা এবং ফুফুগণ

ইবনে আল কায্যিমের মতে নবীজির ﷺ চাচাগণ ছিলেন— ২৪১

- ১। শহীদদের নেতা হামজা।
- ২। আল-আব্বাস।
- ৩। আবু তালিব (মূল নাম 'আব্দে মানাফ)।
- ৪। আবু লাহাব (মূল নাম আবদুল উযয...
- ৫। যুবাইর।
- ৬। আব্দুল কাবা।
- ৭। মুকাওইম।
- ৮। যিরার।
- ৯। কুসাম।
- ১০। মুগীরা (মূল নাম হাজাল)।
- ১১। গাদাক (মূল নাম মুসআব)।

কিছু জীবনীকার নওফেল ও হারিসের কথা বলেন। বলা হয়—হারিস ও মুকাওইম একই ব্যক্তি ছিলেন। হারিস সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং সবচেয়ে কনিষ্ঠজন ছিলেন আব্বাস।

নবীজির ﷺ সাত চাচা ইসলাম আবির্ভাবের আগেই মারা যান; বেঁচে ছিলেন চারজন : আবু তালিব, আবু লাহাব, হামজা এবং আব্বাস। শেষ দুজন মুসলিম হয়েছিলেন।

নবীজির ﷺ ছয় জন ফুফু ছিলেন—

- ১। সাফিইয়্যা (জুবায়ের ইবনুল আওয়ামের মা)।
- ২। আতিকা।



৩। বাররা।

৪। আরওয়া।

৫। উমায়মা।

৬। উন্মে হাকীম বায়দা।

তাদের মধ্যে সাফিয়া মুসলিম হয়েছিলেন, এটি সুনিশ্চিত। তবে আতিকা ও আরওয়া মুসলিম হয়েছিলেন কি না—এ-ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে।

নবীজির ﷺ তিন দুধভাই ও দুই দুধবোন ছিলেন। তারা হলেন—

১। হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব।

২। আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ।

৩। আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস।

৪। উনায়সা বিনতে হারিস।

৫। শায়মা বিনতে হারিস।

## নবীজি ﷺ আত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে বলতেন

জায়িদ ইবনে আরকাম থেকে বর্ণিত, মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী খুম নামক নদীর ধারে নবীজি ﷺ আমাদের মাঝে একদিন উঠে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। প্রথমে তিনি ﷺ আল্লাহর প্রশংসা করলেন, এরপর আমাদের নাসিহা আকারে বললেন, “শোনো, আমি তো কেবল একজন মানুষ; হয়তো সে-সময় খুব কাছে যখন আল্লাহর বার্তাবাহক আসবে, আর আমিও ফিরে যাব (মারা যাব)। আমি তোমাদের মাঝে দুটো ভারী জিনিস রেখে যাচ্ছি—প্রথমটি কুরআন, যাতে আছে পথনির্দেশনা ও আলো; যে এটি দৃঢ়ভাবে ধরে থাকবে, সে হেদায়েত পাবে, নাহলে পথভ্রষ্ট হবে। আর (দ্বিতীয়) হলো, আমার আহল—আমার পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের খেয়াল রেখো (তিনবার বললেন)।”

আবু বাকর রাযি. বলতেন, “নবীজির ﷺ পরিবারের যত্ন নাও।” ২৪২

ইবনে হাজার রাহ. বলেন, “এর অর্থ, তার পরিবারের প্রতি ক্ষতি বা খারাপ

আচরণ কোরো না।” ২৪৩

হুসাইন ইবনে সাবরা রাযি. যায়েদকে রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তাঁর আহল কারা? তাঁর স্ত্রীগণ কি এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত?’ তিনি বললেন, ‘তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর আহলের অন্তর্গত, কিন্তু এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে, যারা সাদাকা নিতে পারবে না।’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তারা কারা?’ যায়েদ উত্তর দিলেন, ‘আলির পরিবার, আকিলের পরিবার, জাফরের পরিবার এবং আব্বাসের পরিবার।’ ২৪৪

আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, আবু বাকর রাযি. আলীকে রাযি. বললেন, “যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ, আমি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষায় নিজের আত্মীয়দের তুলনায় নবীজির ﷺ আত্মীয়দের বেশি গুরুত্ব দেব।” ২৪৫

## নবীজি ﷺ তাঁর মায়ের কবর দেখতে গিয়ে কাঁদতেন

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ তাঁর মায়ের কবর দেখতে যেতেন। সেখানে তিনি কাঁদতেন এবং তাঁর আশেপাশে যারা থাকত, তারাও কাঁদত। তিনি ﷺ বলতেন, “আমি আমার রবেবর কাছে তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করার অনুমতি চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দেননি; তখন আমি তার কবর যিয়ারতের জন্য অনুমতি চেয়েছি। তাই কবর জিয়ারত করো, এটা মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়।” ২৪৬ তাঁর ﷺ কাঁদার কারণ ছিল তাঁর মা ইসলাম আসার আগেই মারা গিয়েছিলেন।

বুরাইদা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ চিহ্নিত-করা এক কবরের কাছে পৌঁছলেন। তিনি বসলেন, তাঁর সাথে সাহাবীরাও বসল। তারপর তিনি এমনভাবে মাথা নাড়ালেন, যেন কথা বলবেন, কিন্তু কাঁদা শুরু করলেন। উমার ইবনে খাতাব রাযি. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনি কাঁদছেন কেন, আল্লাহর রাসূল?’ তিনি ﷺ বললেন, “এটি আমিনা বিনতে ওহাবের কবর। আমি আমার রবেবর কাছে তার কবর যিয়ারত করার অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করার অনুমতি

[২৪৩] ফাতহুল বারী (৭৯/৭)।

[২৪৪] মুসলিম (২৪০৮)।

[২৪৫] বুখারী (৩৭১২)।

[২৪৬] মুসলিম (৯৭৬)।



চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন না। তাই আমি দুঃখে কাঁদছি।” বুরাইদা বলেন, “আমি তখনকার মতো এত বেশি মানুষ কাঁদতে কখনো দেখিনি।” ২৪৭

## নিকটাত্মীয়দের ইজলাঈমের দিকে ডাকতেন

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, “তোমার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করো!”— আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করলে নবীজি ﷺ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “হে কুরাইশ, নিজেদের রক্ষা করো, আমি তোমাদের আল্লাহর কাছ থেকে রক্ষায় কিছুই করতে পারব না। হে আন্দে মানাফের সন্তানেরা, নিজেদের রক্ষা করো, আমি তোমাদের আল্লাহর কাছ থেকে রক্ষায় কিছুই করতে পারব না। হে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, নিজেকে রক্ষা করুন, আমি আপনাকে আল্লাহর কাছ থেকে রক্ষায় কিছুই করতে পারব না। হে সাফিয়া, নবীর ফুফু, নিজেকে রক্ষা করুন, আমি আপনাকে আল্লাহর কাছ থেকে রক্ষায় কিছুই করতে পারব না। হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ, আমার সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও, আমি তোমাদের আল্লাহর কাছ থেকে রক্ষায় কিছুই করতে পারব না।” ২৪৮

নববী রাহ. বলেন, “এর অর্থ হলো, আখিরাতে মুক্তি পেতে তারা যেন নবীজির ﷺ সাথে সম্পর্কের ওপর নির্ভর না করে। কারণ, আল্লাহর নির্ধারিত কোনো ক্ষতি থেকে তাদের রক্ষা করার কোনো ক্ষমতা তাঁর নেই।” ২৪৯

মুসলিমে বর্ণিত এ-হাদীসের শেষে আরও বলেছেন, “কিন্তু আমার সাথে আপনাদের আত্মীয়তার বন্ধন আছে, সেটি আমি ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে ধরে রাখব।” ২৫০

ইবনে হাজার রাহ. বলেন, “আল্লাহ নবীজিকে ﷺ প্রথমে তাঁর ঘনিষ্ঠ নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করতে বলার কারণ হলো, যদি তারা ইসলামের সত্যতা মেনে

[২৪৭] দালা'ঈল আন-নুবুওয়্যাহ গ্রন্থে বায়হাকী (১৮৯/১)।

[২৪৮] বুখারী (২৭৫৩) ও মুসলিম (২০৬)।

[২৪৯] মুসলিম গ্রন্থের (৮০/৩) ব্যাখ্যায় নববী (রাহ.)।

[২৫০] মুসলিম (২০৪)।

নেয়, তবে অন্যদেরও ইসলামের পথে আনা যাবে।” ২৫১

নবীজি ﷺ আলিকে রাখি. ছোট থাকা অবস্থাতেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম শিশু।

তিরমিযী রাহ. বলেন, “আলিমদের মাঝে কেউ কেউ বলেন যে, প্রথম প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম ছিলেন আবু বাকর, আলি মাত্র আট বছর বয়সে মুসলিম হন এবং খাদিজা ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম নারী।” ২৫২

## চাচা আবু তালিবকে পথদর্শনে আগ্রহী ছিলেন

সাইদ ইবন মুসায়্যিব রাহ. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, “যখন আবু তালিব মূর্খ অবস্থায় পৌঁছলেন, তখন নবীজি ﷺ তার কাছে গেলেন। আবু জাহল তখন তার কাছে বসে ছিল। নবীজি ﷺ তাকে লক্ষ করে বললেন, “চাচাজান, اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ কালেমাটি একবার পড়ুন, তা হলে আমি আপনার জন্য আল্লাহর কাছে কথা বলতে পারব।” তখন আবু জাহল ও আবদুল্লাহ ইবনু আবু উমাইয়া বলল, ‘আবু তালিব, তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম হতে ফিরে যাবে?’ এরা দুজন তার সাথে এ-কথাটি বারবার বলতে থাকল। সর্বশেষ আবু তালিব তাদের সাথে বলল, ‘আমি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাতের উপরেই আছি।’ এ-কথার পর নবীজি ﷺ বললেন, “আমি আপনার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকব, যে-পর্যন্ত আপনার ব্যাপারে আমাকে নিষেধ করা না হয়।’ এ প্রসঙ্গে এ-আয়াতটি নাযিল হলো—‘নবী ও মুমিনদের পক্ষে উচিত নয় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে মুশরিকদের জন্য—যদি তারা নিকটাত্মীয়ও হয়, যখন তাদের কাছে এ-কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামী।’ (আল কুরআন, ৯:১১৩)। আরও নাযিল হলো, “আপনি যাকে ভালোবাসেন, ইচ্ছা করলেই তাকে হিদায়াত করতে পারবেন না।” (আল কুরআন, ২৮:৫৬) ২৫৩

অন্য হাদীসে এসেছে, নবীজি ﷺ তাকে বললেন, “চাচা, বলুন, ‘আল্লাহ ছাড়া

[২৫১] ফাতহুল বারী (৫০৩/৮)।

[২৫২] তিরমিযী (৬৪২/৫)।

[২৫৩] বুখারী (৩৮৮৪) ও মুসলিম (২৪)।



ইবাদাতের যোগ্য কেউ নেই’, আমি তা হলে আল্লাহর সামনে আপনার জন্য এ-ব্যাপারে সাক্ষ্য দেব।” ২৫৪

আরেকটি সহীহ হাদীসে এসেছে, আহমদ বর্ণনা করেন, আবু তালিব নবীজিকে ﷺ বলেছিলেন, “এমন যদি না হতো যে, কুরাইশরা আমার সমালোচনা করে বলবে, মৃত্যুভয়ে আমি কথাগুলো বলছি, তা হলে আমি অবশ্যই তোমাকে খুশি করার জন্য কথাগুলো বলতাম।” ২৫৫

আবু তালিব কাফের হয়ে মারা গেলেও নবীজি ﷺ তার জন্য সুপারিশ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সুপারিশের কারণেই আবু তালিব জাহান্নামে সবচেয়ে কম শাস্তি পাবে। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন, “জাহান্নামে সবচেয়ে কম শাস্তি আবু তালিব পাবে। তা হলে তিনি (আগুনের) দুটো জুতা পরে থাকবেন, যা তার মগজকে পর্যন্ত সিদ্ধ করে ফেলবে।” ২৫৬

আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল, আবু তালিব কি আপনার কারণে উপকৃত হবে? কারণ, তিনি তো আপনার হিফাযাত করতেন, আপনার পক্ষ হয়ে (অন্যের প্রতি) ক্রোধান্বিত হতেন। রসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন, “হ্যাঁ, তিনি কেবল পায়ের গ্রন্থি পর্যন্ত জাহান্নামের আগুনে থাকবেন, আর যদি আমি না হতাম তবে জাহান্নামের অতল তলেই তিনি অবস্থান করতেন।” ২৫৭

## চাচা আব্বাসের সাথে পরামর্শ করতেন

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, আব্বাস রাযি. মক্কা বিজয়ের বছরে নবীজির ﷺ কাছে আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের সঙ্গে এলেন। আবু সুফিয়ান মক্কার কাছাকাছি একটি স্থানে ইসলাম গ্রহণ করলেন। আব্বাস রাযি. বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল, আবু সুফিয়ান সম্মান ও গৌরব পছন্দ করে, সেজন্য আপনি কি তাকে কিছু দিতে পারবেন?’ তিনি ﷺ বললেন, “হ্যাঁ, যে আবু সুফিয়ানের ঘরে থাকবে, সে নিরাপদ

[২৫৪] বুখারী (১৩৬০)।

[২৫৫] আহমাদ (৯২৩৭)।

[২৫৬] মুসলিম (২১১)।

[২৫৭] মুসলিম (২০৯)।

থাকবে; যে নিজের বাড়িতে থাকবে, সে নিরাপদ থাকবে।” ২৫৮

## আত্মীয়দের আদালত গণ্যশোধন করতেন

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, “আমি আমার চাচী (আল্লাহর রাসূলের স্ত্রী) মায়মুনার বাড়িতে রাত কাটলাম। নবী ﷺ তাঁর প্রয়োজনাতি সেৱে মুখ-হাত ধুয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর জেগে উঠে তিনি পানির মশকের (পাত্র) মুখ খুললেন। এরপর মাঝারি রকমের এমন উয়ু করলেন যে, তাতে বেশি পানি লাগালেন না, অথচ পুরো উয়ুই করলেন। তারপর তিনি সালাত আদায় করতে লাগলেন। তখন আমিও জেগে উঠলাম। তবে আমি কিছুটা পরে উঠলাম। এজন্য যে, আমি এটা পছন্দ করলাম না, তিনি আমার অনুসরণকে দেখে ফেলেন। যা হোক, আমি উয়ু করলাম। তখনো তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আমি গিয়ে তাঁর বাম পার্শ্বে দাঁড়লাম। তখন তিনি আমার কান ধরে তাঁর ডান দিকে আমাকে ঘুরিয়ে নিলেন। এরপর তের রাকআত সালাত পূর্ণ করলেন।” ২৫৯

## কেউ পাপ করতে গেলে তাকে থামাতেন

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, ফযল ইবনে আব্বাস রাযি. একই বাহনে আল্লাহর রাসূলের ﷺ পিছনে বসেছিলেন। এরপর খাশআম গোত্রের জনৈক মহিলা উপস্থিত হলো। তখন ফযল রাযি. সেই মহিলার দিকে তাকাচ্ছিলেন এবং মহিলাটিও তার দিকে তাকাচ্ছিল। আল্লাহর রাসূল ﷺ ফযলের চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন। মহিলাটি বলল, ‘আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর বান্দার উপর ফরযকৃত হজ্ব আমার বয়োঃবৃদ্ধ পিতার উপর ফরজ হয়েছে। কিন্তু তিনি বাহনের উপর স্থির থাকতে পারেন না, আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হজ্ব আদায় করবো?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ (আদায় কর)।” ঘটনাটি বিদায় হজ্বের সময়ের। ২৬০

[২৫৮] আবু দাউদ (৩০৩১)।

[২৫৯] বুখারী (৬৩১৬) ও মুসলিম (৭৬৩)।

[২৬০] বুখারী (১৫১৩) ও মুসলিম (১৩৩৪)।



## গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আত্মীয়দের সাহায্য চাইতেন

কাব ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত আকাবার শপথের ঘটনায় তিনি বলেন, “আমরা হজ্জের জন্য বের হলাম এবং তাশরীকের দিনগুলোর (জিলহজ্জের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ) মাঝের দিনে নবীজি ﷺ আকাবায় আমাদের সাথে দেখা করবেন বলে জানালেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ আগমনের অপেক্ষায় ছিলাম। একসময় তিনি তাঁর চাচা আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবের সাথে এলেন। আব্বাস তখনো তার পিতৃধর্মের অনুসারী ছিলেন। তবে ভাতিজা মুহাম্মদের ﷺ কাজে তিনি যুক্ত থাকতে আগ্রহী ছিলেন, যেন তিনি নিরাপদ থাকেন।

আমরা বসে পড়লাম। আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব প্রথম কথা বললেন, “খায়রাজের লোকজন, আমাদের মধ্যে মুহাম্মদ ﷺ-এর অবস্থা সম্পর্কে তোমরা জানো। আমরা তাঁকে আমাদের লোকদের থেকে নিরাপত্তা দিয়েছি। ফলে তিনি এ-এলাকায় সুরক্ষিত এবং নিরাপদ আছেন। এখন তিনি তোমাদের সাথে মিলিত হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখন তোমরা যদি মনে করো যে, মুহাম্মদকে ﷺ দেওয়া প্রতিশ্রুতিসমূহ তোমরা পুরোপুরি পালন করতে পারবে এবং বিরোধিতাকারীদের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করতে পারবে, তা হলে তো ভালোই। আর যদি তোমরা মনে করো, মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে রক্ষা করতে পারবে না, তবে তাঁকে রেখে যাও। কারণ, তিনি নিজ সম্প্রদায় থেকে নিরাপদে আছেন।” আনসাররা বললেন, “আপনার কথা আমরা শুনেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ, এবার আপনি কথা বলুন এবং আপনার প্রতিপালকের পক্ষে আমাদের থেকে যত অঙ্গীকার নিতে চান, নিন।” রাসূলুল্লাহ ﷺ কথা বললেন, কুরআন তিলাওয়াত করলেন, তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিলেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন...” ২৬১

## আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন

নবীজি ﷺ আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন, এমন বহু উদাহরণ পাওয়া যাবে। তিনি তাদের ব্যাপারে সজাগ থাকতেন, তাদের মধ্যে কেউ অবিবাহিত থাকলে

তার বিয়ের ব্যবস্থা পর্যন্ত করতেন।

উদাহরণস্বরূপ, আবদুল মুত্তালিব ইবনে রাবীআ ইবনে হারিস থেকে বর্ণিত, একবার রাবীআ ইবনু হারিস ও আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্তালিব রাযি. সম্মিলিতভাবে বললেন, 'আমরা যদি এ-ছেলে দুটিকে (অর্থাৎ রাবীআ ইবনু হারিস ও ফাযল ইবনু আব্বাস রাযি.) রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে যদি পাঠিয়ে দিতাম এবং তারা উভয়ে তাঁর কাছে গিয়ে তাদেরকে যাকাত আদায়কারী হিসেবে নিয়োগের জন্য আবেদন করত, তা হলে তারা অন্যান্য আদায়কারীদের ন্যায় যাকাত আদায় করে এনে দিত এবং অন্যান্যরা যেভাবে পারিশ্রমিক পায়, তারাও সেভাবে পারিশ্রমিক পেত।' তারা এ-ব্যাপার নিয়ে আলাপ করছিলেন, এমন সময় আলি ইবনু আবু তলিব রাযি. এসে তাদের মাঝে দাঁড়ালেন। তারা এ-প্রস্তাবটি তার কাছে জানালেন।

আলী রাযি. বললেন, 'তোমরা এ-কাজ কোরো না। আল্লাহর শপথ, তিনি এটা করবেন না (কারণ আমাদের জন্য যাকাত হারাম)।' তখন রাবীআ ইবনু হারিস রাযি. তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'আল্লাহর শপথ, তুমি শুধু বিদ্বেষের কারণে আমাদের এরকম বলছ। অথচ তুমি যে রাসূলুল্লাহর ﷺ জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছ, এজন্যে তো তোমার প্রতি আমরা কোনো বিদ্বেষ পোষণ করছি না। তখন আলী রাযি. বললেন, 'এদের দুজনকে পাঠিয়ে দাও।' তারা দুজন চলে গেল এবং আলি রাযি. তার জামা খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ে বললেন, 'আমি হাসানের পিতা। আল্লাহর কসম, তোমরা (না-বোধক) উত্তর নিয়ে আসা পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ব না।'

আবদুল মুত্তালিব বললেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের সালাত আদায় করলেন। আমরা তাড়াতাড়ি তাঁর ফিরে আসার আগেই তাঁর ঘরের কাছে গিয়ে তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। তিনি এসে আমাদের দুজনের কান ধরে (স্নেহসিক্ত কণ্ঠে) বললেন, "তোমাদের মনের কথাটা বলে ফেলো।" তারপর তিনি ও আমরা ছজরার মধ্যে প্রবেশ করলাম। এ-সময় তিনি যায়নাব বিনতে জাহশের রাযি. ঘরে অবস্থান করছিলেন।

এবার আমরা পরস্পরকে কথাটি তোলার জন্য বলছিলাম। অবশেষে আমাদের একজন বললাম, 'আল্লাহর রাসূল, আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহকারী এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী। আমাদের এখন বিয়ের বয়স হয়েছে, অথচ আমরা বেকার। তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি; অন্যান্য যাকাত আদায়কারীদের মতো আপনি আমাদেরকেও যাকাত আদায়কারী হিসেবে নিয়োগ করুন; অন্যান্যরা যেভাবে যাকাত আদায় করে



এনে দেয়, আমরা তা-ই করব এবং তাতে আমরাও কিছু পারিশ্রমিক পাব।’ এ-কথার পর তিনি দীর্ঘ সময় ধরে চুপ করে থাকলেন। এমনকি আমরা পুনর্বার আমাদের কথা বলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। পর্দার আড়াল থেকে যায়নাব রাযি. কথা না বলার জন্য আমাদেরকে ইঙ্গিত করলেন।

এরপর তিনি বললেন, “মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজন তথা বংশধরদের জন্য ‘যাকাত’ গ্রহণ করা সমীচীন নয়। কেননা, যাকাত হলো মানুষের (সম্পদের) ময়লা। ২৬২ বরং তোমরা মাহমিয়া এবং নাওফাল ইবনু হারিস ইবনু আবদুল মুত্তালিবকে আমার কাছে ডেকে আনো।” মাহমিয়াহ বনু আসাদ গোত্রের লোক ছিল। তাকে খুমুস বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তারা দুজনে উপস্থিত হলে প্রথমে তিনি মাহমিয়াকে বললেন, “তুমি তোমার কন্যাকে এ-ছেলে অর্থাৎ ফাযল ইবনু আব্বাসের সাথে বিয়ে দাও। তিনি তা-ই করলেন।” তারপর তিনি নাওফাল ইবনু হারিসকে বললেন, “তুমি এ-ছেলের (অর্থাৎ আমার) সাথে তোমার কন্যার বিয়ে দাও।” তিনি আমাকে বিয়ে করিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি মাহমিয়াকে বললেন, “এ-দুজনের পক্ষ থেকে এত এত পরিমাণ মহরানা খুমুসের তহবিল থেকে আদায় করে দাও।” ২৬৩

## আত্মীয়দের প্রতি উদার আচরণ করতেন

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, যখন বদর যুদ্ধের বন্দিদের নিয়ে আসা হলো, তাদের মাঝে নবীজির ﷺ চাচা আব্বাস ছিলেন। তার পরিহিত কোনো পোশাক ছিল না। তিনি ﷺ তার জন্য জামার ব্যবস্থা করতে বললেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের (মুনাফিকদের নেতা) কাছে তার পরার জন্য একটি জামা পাওয়া গেল। নবীজি ﷺ তার চাচাকে সেই জামাটি দিলেন। এ-কারণে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা যাবার পর তাকে নবীজি ﷺ নিজের জামা দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন।

আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত, একবার নবী ﷺ এর কাছে বাহরাইন থেকে কিছু সম্পদ এলো। তিনি বললেন, “তোমরা এগুলো মসজিদে ঢেলে দাও। এটি ছিল তাঁর কাছে-আসা সবচেয়ে বেশি সম্পদ। তিনি মসজিদে সালাত আদায় করতে গেলেন

[২৬২] এটি মানুষের সম্পদ এবং আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে।

[২৬৩] মুসলিম (১০৭২)।

এবং সম্পদগুলোর দিকে ঘুরেও তাকালেন না। এরপর তিনি সালাত শেষে সম্পদগুলো বিতরণ শুরু করলেন এবং এর কিছু কিছু করে যাকে পেলেন, তাকেই দিলেন।

এ-সময় আব্বাস রাযি. এসে বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল, আমাকে দান করুন। আমি আমার এবং আকীলের মুক্তিপণ দিয়েছি।’ আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, “আচ্ছা নাও।” তিনি তার কাপড়ে অঞ্জলি ভরে নিতে লাগলেন। তারপর তা উঠাতে চাইলেন, কিন্তু উঠাতে পারলেন না। তখন তিনি বললেন, ‘কাউকে আমার উপর এ-বোঝা উঠিয়ে দিতে বলুন।’ আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, “না।” তখন তিনি বললেন, ‘তা হলে আপনিই আমার উপর উঠিয়ে দিন।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “না।”

তিনি তা হতে কিছু কমালেন এবং উঠাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু উঠাতে পারলেন না। তারপর বললেন, ‘কাউকে আমার উপর বোঝাটি উঠিয়ে দিতে বলুন।’ তিনি বললেন, “না।” তখন আব্বাস রাযি. বললেন, ‘আপনিই একটু আমার উপর উঠিয়ে দিন।’ আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, “না।” তখন তিনি আবার তা হতে কমালেন এবং কাঁধে উঠিয়ে রওনা হলেন।

তার এ-আসক্তি দেখে বিস্ময়ের সাথে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকিয়ে থাকলেন, যতক্ষণ না তিনি আমাদের দৃষ্টির আড়াল হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে-স্থানে একটি দিরহাম থাকা পর্যন্ত সেখান হতে উঠে দাঁড়াননি। ২৬৪

ইবনে রজব আল-হাম্বলী বলেন, “এই হাদীস নবীজির ﷺ উদারতার দৃষ্টান্ত। সম্পদ যতই থাকুক না কেন, সেটার দিকে তিনি মুখ ফিরিয়েও দেখতেন না। অন্যদিকে আব্বাস বেশ তাগড়া এবং শক্তিশালী মানুষ ছিলেন, তাকেও অনেক সম্পদ তুলে নিতে বাধা দেননি। তিনি ﷺ সম্পদগুলো তোলায় নিজে বা অন্য কাউকে দিয়ে সাহায্য না করার কারণ—হয়তো—তিনি চাচ্ছিলেন তার চাচা যতটুকু নিজে বহন করতে পারে, ততটুকুই যেন নেয়।” ২৬৫

আব্বাসকে কুরাইশদের মাঝে ধনী হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু বদরের যুদ্ধে বন্দি থেকে মুক্তি পেতে তিনি তার নিজের ও তার ভাতিজা আকীলের মুক্তিপণ দিতে গিয়ে তার অনেক ঋণ হয়ে গিয়েছিল।

[২৬৪] বুখারী (৩১৬৫), ফাতহুল বারী (৫১৬/১)।

[২৬৫] ফাতহুল বারী (১৭৮/৩)।



## নবীজি ﷺ আত্মীয়দের হজ্জের ব্যাপারে অনেক আগ্রহী ছিলেন

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবাতা বিনতে যুবায়র-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার হজ্জে যাবার ইচ্ছে আছে?” সে উত্তর দিল, ‘আল্লাহর কসম, আমি খুবই অসুস্থবোধ করছি (তবে হজ্জে যাবার ইচ্ছে আছে)।’ তার উত্তরে বললেন, “তুমি হজ্জের নিয়্যতে বেরিয়ে যাও এবং আল্লাহর কাছে নিয়ত করে বলো, ‘আল্লাহ, যেখানেই আমি বাধাগ্রস্ত হব, সেখানেই আমি আমার ইহরাম শেষ করব।’” ২৬৬

## আত্মীয়দের স্বাস্থ্য ও জার্বিক অবস্থা জল্পর্কে খাঁজখবর নিতেন

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ হাযমের পরিবারকে সাপের কামড়ে রুকইয়াহ ২৬৭ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি ﷺ আসমা বিনতে উমায়্যেসকে একবার জিজ্ঞেস করলেন, “আমার ভাইয়ের সন্তানদের দুর্বল ও পাতলা দেখছি কেন? দারিদ্র্যের আঘাতে তারা জর্জড়িত হয়ে পড়েছে?” আসমা জবাব দিলেন, ‘না, তাদের ওপর বদনজর পড়েছে।’ তিনি ﷺ বললেন, “তাদের ওপর রুকইয়াহ করো।” আমি যে রুকইয়াহ করি, সেটির কথা তাঁকে বললাম। তিনি ﷺ আবার বললেন, “তাদের ওপর রুকইয়াহ করো।” ২৬৮

উম্মে মুনযির বিনতে কায়স রাযি. বলেন, “নবীজি ﷺ ও আলি আমার বাসায় এলেন। আমাদের কিছু কাঁচা খেজুর ছিল, নবীজি ﷺ সেগুলো খেতে শুরু করলেন। আলি কেবলই রোগ সেরে উঠেছে, তিনিও কিছু খেজুর খেতে চাইলেন। নবীজি ﷺ তাকে বলেন, “খেও না। তুমি কেবলি সেরে উঠেছ।”

তখন আমি বার্লি ও সবজি দিয়ে কিছু খাবার বানিয়ে নিয়ে এলাম। তখন নবীজি

[২৬৬] বুখারী (৫০৮৯) ও মুসলিম (১২০৭)।

[২৬৭] রুকইয়াহ বলতে শরীয়তসম্মত ঝাড়ফুককে বুঝায়। অর্থাৎ, কুরআনের আয়াত, আল্লাহর নামের যিকর, রাসূল ﷺ এর হাদিসে বর্ণিত দোয়া পাঠ করার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে কোন বিপদ থেকে মুক্তি চাওয়া কিংবা রোগ থেকে আরোগ্য কামনা করা। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে মাকতাবাতুল আসলাফ থেকে প্রকাশিত আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ রচিত ‘রুকইয়াহ’ বইয়ে দেখুন। - সম্পাদক

[২৬৮] মুসলিম (২১৯৮)।

বললেন, “আলী, এ থেকে যা ইচ্ছা খাও, এটা তোমার জন্য ভাল।” ২৬৯

## আত্মীয়দের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিতেন

নবীজি ﷺ মদীনা হিজরতের রাতে আলিকে রাযি. তাঁর জায়গায় ঘুমাতে বলেছিলেন। তিনি ﷺ তাকে খাইবার বাহিনীর সেনাপতি হিসেবেও নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি তাকে হজ্বের সময় উট জবাই করা, মাংস, চামড়া ইত্যাদি বিতরণ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ২৭০

আলি রাযি. থেকে বর্ণিত, “নবীজি ﷺ হজ্বের সময় একশ উট কুরবানী করার জন্য আনলেন। এরপর আমাকে সেগুলোর মাংস, চামড়া, পিঠের গদি ও কাপড় বিতরণ করার আদেশ দিলেন।” ২৭১

নবীজি ﷺ তাঁর চাচাতো ভাই জাফর ইবনে আবু তালিবকে হাবশায় (ইথিওপিয়া) হিজরতের প্রধান করেছিলেন। তিনি নাজ্জাশীর কাছে ইসলামের বার্তা নিয়ে যান এবং তার কাছে ইসলাম সম্পর্কে তুলে ধরেন।

## জাফরের হাবশা থেকে ফিরে আসায় নবীজি ﷺ অনেক খুশি হয়েছিলেন

জাফর রাযি. খাইবার বিজয়ের পর মদীনায় ফিরে এলেন। নবীজি ﷺ তাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে আলিঙ্গন করলেন এবং চোখে চুমো দিয়ে বললেন, “খাইবার বিজয় আর জাফরের ফিরে আসা—কোনটিতে আমি বেশি খুশি বলতে পারব না।” ২৭২

নবীজি ﷺ তাকে মসজিদের পাশেই থাকার জায়গা দিলেন এবং খাইবারের গনিমত থেকে তাকে সম্পদ দিলেন। এরপর মুতার যুদ্ধে যায়েদ বিন হারিসার পর তাকে সেনাপতির দায়িত্ব দিলেন।

[২৬৯] আবু দাউদ (৩৮৫৬), তিরমিযী (১৯৬০) ও ইবন মাজাহ (৩৪৪২)।

[২৭০] বুখারী (১৭০৭) ও মুসলিম (১৩১৭)।

[২৭১] বুখারী (১৭১৮) ও মুসলিম (২৩২১)।

[২৭২] হাকিম (৪২৪৯)।



আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাযি. থেকে বর্ণিত, “নবীজি ﷺ সেনাপতি হিসেবে জায়িদ ইবনে হারিসাকে একদল সৈন্যসহ পাঠালেন এবং বললেন, “যায়েদ যদি শহীদ হয়, তা হলে জাফর সেনাপতি হবে; জাফর যদি শহীদ হয়, তা হলে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাহ সেনাপতি হবে।” তারপর (যুদ্ধের) খবর নবীজির ﷺ কাছে এলো। তিনি মানুষের সামনে উঠে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা করে বলা শুরু করলেন, “তোমাদের ভাই ও শত্রুরা যুদ্ধে নেমেছে।” যায়েদ পতাকা নিলেন এবং তিনি শহীদ হলেন। এরপর জাফর ইবনে আবু তালিব পতাকা নিলেন, তিনিও শহীদ হলেন। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাহ পতাকা নিলেন, তিনিও শহীদ হলেন। এরপর আল্লাহর অন্যতম তরবারি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ পতাকা নিলেন এবং জয়লাভ করলেন।”

এরপর তিনি ﷺ জাফরের পরিবারের কাছে (শোক কাটার জন্য) তিনদিন পর এলেন। তাদের সান্ত্বনা দিলেন, “আজকে বা কালকের পর থেকে আমার ভাইয়ের জন্য তোমরা কেঁদো না। আমার ভাইয়ের বাচ্চাদের (যে-কোনো প্রয়োজনে) আমাকে তোমরা ডাক দিয়ো।” আমরা ছোট পাখির ছানাদের মতো তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, “নাপিতকে ডাক দাও।” নাপিত এসে আমাদের মাথা কামিয়ে দিল (কারণ, তাদের মা তাদের বাবার মৃত্যুতে দুঃখ-ভারাক্রান্ত ছিলেন, তাই তাদের যত্ন নিতে পারছিলেন না)।

এরপর নবীজি ﷺ বললেন, “মুহাম্মদ যেমন তাঁর চাচার মতো দেখতে, তেমনি আবদুল্লাহ আমার মতো চেহারা ও আচরণে।” তিনি এটি তিনবার বললেন। তখন আমাদের মা তাঁর কাছে এসে দুঃখ করে বলল, ‘আমরা এখন ইয়াতীমা’ তখন নবীজি ﷺ তাকে বললেন, “তুমি তাদের জন্য দারিদ্র্যের ভয় করছ কেন! আমি তাদের এই দুনিয়ায় ও আখিরাতে রক্ষক ও অভিভাবক।” ২৭৩

## ছোট শিশুদের মাথায় হাত রেখে দুআ করতেন

আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাযি. থেকে বর্ণিত, “আমি এবং আব্বাসের দুই ছেলে কুসাম আর উবায়দুল্লাহ খেলা করছিলাম। নবীজি ﷺ তাঁর বাহনে করে আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি লোকদের বললেন আমাকে তুলে দিতে এবং তাঁর সামনে

বসালেন। এরপর কুসামকে তুলে দিতে বললেন এবং তাকে পেছনে বসালেন। তারপর নবীজি ﷺ আমার মাথা তিনবার স্পর্শ করে বললেন, “আল্লাহ, জাফরের সন্তানদের দেখে রাখুন।” ২৭৪

## আত্মীয়দের যত্ন করার ঘটনা

আত্মীয়দের কেউ বিপদে পড়লে নবীজি ﷺ কষ্ট পেতেন। হামজা রাযি. শহীদ হলে এবং তার মৃতদেহ ক্ষতবিক্ষত করায় তিনি অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন।

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, “হামজা রাযি. শহীদ হওয়ার পর নবীজি ﷺ তার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ-দৃশ্য তাঁর জন্য অনেক কষ্টকর ছিল। তিনি হামজার উদ্দেশ্যে বললেন, “আপনার উপর আল্লাহ রহম করুন। আপনি আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখায় খুব ভালো ছিলেন এবং অনেক ভালো কাজ করতেন। আপনার রেখে-যাওয়া (পরিবারের) মানুষগুলো কষ্ট না পেলে আমি এভাবেই আপনাকে রেখে দিতাম, যেন বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনি পুনরুত্থিত হোন। আল্লাহর কসম, আমি আপনার বদলায় তাদের ৭০ জনকে ক্ষতবিক্ষত করব।”

তখন আল্লাহ নবীজির ﷺ কাছে জীবরিলের মারফত ওহী প্রেরণ করে জানালেন, “যদি তুমি শাস্তি দাও, তবে তোমার যা ক্ষতি করেছে, তার সমপরিমাণ শাস্তি দাও। কিন্তু তুমি যদি ধৈর্যশীল থাকো, তা হলে ধৈর্যশীলদের জন্য এটিই (ধৈর্য ধরা) উত্তম।” (আল কুরআন, ১৬: ১২৬) এজন্য নবীজি ﷺ তাঁর শপথের কাফফারা দিলেন এবং তাঁর পরিকল্পনা ত্যাগ করলেন।” ২৭৫

## আত্মীয়দের জন্য আল্লাহর নিকট দূআ করতেন

নবীজি ﷺ আব্বাস ও তাঁর সন্তানদের জন্য দূআ করতেন। ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, “নবীজি ﷺ আব্বাসকে বললেন, “কাল সোমবার আপনার সন্তানদের আমার কাছে আনবেন, আমি আপনার ও তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দূআ করব।

[২৭৪] আহমাদ (১৭৬৩)।

[২৭৫] হাকিম (৪৮৯৪)। আল-মুজাম আল-কবীর গ্রন্থে (১৪৩/৩) তাবারানী।



আল্লাহ আমার দুআ দ্বারা আপনাকে ও আপনার সন্তানদের উপকৃত করবেন।” তাই আমরা পরদিন নবীজির ﷺ কাছে গেলাম। তিনি আমাদের ওপর একটা কাপড় রেখে দুআ করলেন, “আল্লাহ, আব্বাস ও তার সন্তানদের বাহ্যিক ও গোপন পাপ ক্ষমা করুন, এমনভাবে ক্ষমা করুন যেন তাদের কোনো পাপ না থাকে। আল্লাহ, তাকে এবং তার সন্তানদের রক্ষা করো।” ২৭৬

## অসুস্থ হলে আব্বাসকে দেখতে যেতেন

উম্মে ফযল (আব্বাসের স্ত্রী) থেকে বর্ণিত, একবার আব্বাস রাযি. এত অসুস্থ হয়ে পড়ল যে, মৃত্যু কামনা করে বসল। নবীজি ﷺ তাকে দেখতে এলেন। তিনি তাকে বললেন, “আব্বাস—আল্লাহর রাসূলের চাচা, মৃত্যু কামনা করবেন না। আপনি সৎআমলকারী হলে আরও আমল করতে পারবেন যা আপনার জন্য মঙ্গলজনক। আপনি যদি পাপী হয়ে থাকেন, তা হলে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করতে পারবেন, যা আপনার জন্য মঙ্গলজনক। তাই মৃত্যু কামনা করবেন না।” ২৭৭

## আত্মীয় হলেও ইঞ্জলালের ব্যাপারে কোনো পক্ষপাতিত্ব করতেন না

আনাস ইবনে মালিক রাযি. বর্ণিত, আনসারদের কয়েকজন নবীজিকে ﷺ বললেন, “আমাদের অনুমতি দিন, যেন আমাদের বোনের ছেলে আব্বাসের (বদরে তিনি মুসলিমদের হাতে বন্দি হলে) মুক্তিপণ না নেওয়া হয়।” নবীজি ﷺ (অনুমতি না দিয়ে) জবাব দিলেন, “তার মুক্তিপণে কোনো ছাড় দিও না।” ২৭৮

ইবনে হাজর রাহ. বলেন, “আমাদের বোনের ছেলে আব্বাস”—বলার কারণ হলো, তারা তার বাবা আব্দুল মুত্তালিবের সম্পর্কে মামা ছিলেন। কারণ, আব্দুল মুত্তালিবের মা মদীনার মহিলা ছিলেন। তার নাম সালমা বিনতে আমর ইবনে উহায়হা

[২৭৬] তিরমিযী (২৭৬২)।

[২৭৭] আহমদ (২৬৩৩৩)।

[২৭৮] বুখারী (২৫৩৭)।

এবং তিনি নাজ্জার গোত্রের ছিলেন।”

তারা “আমাদের বোনের ছেলে”—বলার কারণ হলো, এটা তারা তাদের আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে বলছে। “আপনার চাচা” বলেনি তারা; কারণ, এতে রাসূলের জন্য তা বলা হচ্ছে মনে হবে। শব্দ চয়নে তাদের এই প্রজ্ঞা তাদের বুদ্ধিমত্তা ও উত্তম বচনেরই প্রমাণ।” ২৭৯

ইবনে হাজর রাহ. আরও বলেন, “ইবনে আয়িস থেকে বর্ণিত, যখন উমারকে বন্দিদের বাঁধার দায়িত্ব দেওয়া হলো, তখন তিনি আব্বাসকে অনেক জোরে বাঁধলেন। তার ব্যথায় গোঙানি শুনে নবীজি ﷺ ঘুমাতে পারেননি। আনসাররা এটা শুনে তার দড়ির বাঁধন খুলে দিল। যখন তারা বুঝতে পারল নবীজি ﷺ তাদের কাজে খুশি হয়েছেন, তখন তারা তাঁকে আরও খুশি করতে মুক্তিপণ ছাড়াই আব্বাসকে মুক্তি দিতে চাইলেন। কিন্তু নবীজি ﷺ এর অনুমতি দিলেন না।” ২৮০

ইবনে হাজর রাহ. আরও বলেন, “এটা তিনি করার অনুমতি দেননি, কারণ ইসলামে কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই।” ২৮১

[২৭৯] ফাতহুল বারী (১৬৮/৫)।

[২৮০] ফাতহুল বারী (৩২২/৭)।

[২৮১] ফাতহুল বারী (১৬৮/৫)।



## পঞ্চম অধ্যায়

### অতিথির সাথে যেমন ছিলেন নবীজি ﷺ

বর্তমান সময়ে অনেকে দুনিয়াবি প্রয়োজনে আতিথেয়তা করলেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অতিথি আপ্যায়ন খুব কম মানুষকেই করতে দেখা যায়। আল্লাহ মানুষকে এ-কাজের সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন, এ-कारणे ইসলামে আতিথেয়তার অনেক সাওয়াব রয়েছে।

আবু হুরাইরা রাযি. বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন, “যে-ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনে ঈমান রাখে, সে যেন অতিথিকে সম্মান করে।” ২৮২

### গেজবান হিগেবে নবীজি ﷺ

নবীজি ﷺ সর্বাধিক দানশীল ছিলেন এবং হাত খুলে দান করতেন। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, ‘দানের ব্যাপারে নবীজি ﷺ মানুষের মাঝে সবচেয়ে উদার ছিলেন। আর এই উদারতা রমাদানে সবচেয়ে বেশি হত। প্রতি বছর রমাদানে জিবরীল তাঁর কাছে আসতেন এবং তাকে তিনি ﷺ পুরো কুরআন পড়ে শোনাতে। জিবরীল যখন তাঁর সাথে দেখা করতেন, তিনি বাতাসের চেয়েও উদার হয়ে যেতেন (দ্রুতগতিতে দান করতেন)।’ ২৮৩

আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, “নবীজি ﷺ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে

[২৮২] বুখারী (৬০১৮) ও মুসলিম (৪৭)।

[২৮৩] বুখারী (৬) ও মুসলিম (২৩০৮)।

উদার ও সাহসী ছিলেন।” ২৮৪

ইবনে হিব্বান রাহ. বলেন, “উদারতার অন্যতম দিক হলো, অতিথিদের সাথে ভালো আচরণ করা। আরবরা মেহমানকে সম্মান করা ও খাওয়ানোকে উদারতা হিসেবে বিবেচনা করত। যারা এটা করত না, তাদের উদার হিসেবে ধরা হতো না। তারা এটিকে এতই গুরুত্ব দিত যে, কেউ কেউ এক মাইল-দুই মাইল ঘুরে অতিথি (আপ্যায়ন করার জন্য মানুষ) খুঁজে বেড়াত।” ২৮৫

উম্মুল মুমিনীন খাদিজা রাযি. নবীজিকে ﷺ সবচেয়ে কাছে থেকে দেখেছেন, সবচেয়ে ভালোভাবে চিনতেন। তিনি তাঁর ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলেছেন, “আল্লাহর কসম, আপনি আল্লাহর সন্তান সম্পর্ক রক্ষা করেন, সত্যবাদী, অসহায়কে সাহায্য করেন, গরীবকে দান করেন, অতিথিকে সম্মান করেন এবং দুর্বোধ্য (অন্যদের) সাহায্য করেন।” ২৮৬

এর মধ্যে খাদিজা তাঁর গুণ হিসেবে বলেছেন, তিনি “অতিথিকে সম্মান করেন”; নবীজি ﷺ মেহমান ও দূতদের উদারভাবে আতিথেয়তা করতেন।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, “নবীজির ﷺ কাছে কিছু চাইলে তিনি কখনোই ‘না’ বলতেন না।” ২৮৭

নবী রাহ. বলেন, “এর অর্থ হলো, তাঁর কাছে পার্থিব কোনো কিছু চাইলে তিনি কখনোই ‘না’ বলতেন না। এটি তাঁর মহানুভবতার উদাহরণ।” ২৮৮

সাহল ইবনে সাদ থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ উদার এবং তিনি উদারতাকে ভালোবাসেন। তিনি উত্তম আখলাক ভালোবাসেন এবং মন্দ আখলাক ঘৃণা করেন।” ২৮৯ এ-কারণে আমার ইবনে হারিস রাযি. বলেন, “রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুকালে তাঁর সাদা খচ্চর, হাতিয়ার এবং একটি জমি, যা তিনি সাদাকা করেছিলেন রেখে গিয়েছিলেন। এ-সব ছাড়া কোনো স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা, দাস-দাসী বা কোনো জিনিস

[২৮৪] বুখারী (২৮২০) ও মুসলিম (২৩০৭)।

[২৮৫] রওয়াত আল-উকাল (পৃষ্ঠা ২৫৯)।

[২৮৬] বুখারী (৪) ও মুসলিম (১৬০)।

[২৮৭] বুখারী (৬০৩৪) ও মুসলিম (২৩১১)।

[২৮৮] মুসলিম গ্রন্থের (৭১/৫) ব্যাখ্যায় নবী (রাহ.)।

[২৮৯] মুসতাদারাক আল হাকিম (১৫২)।



রেখে যাননি।” ২০ নবীজির ﷺ মৃত্যুর সময় ৩০ সা‘র বিনিময়ে তাঁর বর্ম এক ইহুদীর কাছে বন্ধক রাখা ছিল। ২১

## অতিথিকে সম্মান করা ঈমানের অঙ্গ

নবীজি মুহাম্মদ ﷺ বলেন, “যে-ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনে ঈমান রাখে, সে যেন অতিথিকে সম্মান করে।” ২২

সম্মান করার অর্থ হলো, তাকে হাসিমুখে অভিবাদন করা, আপ্যায়নে দেরি না করা, থাকার নিরাপদ স্থান দেওয়া এবং নিজে খাদ্য পরিবেশন করা।

নবীজি ﷺ অতিথি আপ্যায়নকারীর প্রশংসা করে বলেছেন, সে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, “নবীজি ﷺ তাবুকে এক খুতবায় বলেন, “তার থেকে উত্তম কেউ নেই, যে ঘোড়ার লাগাম ধরে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে এবং মানুষের ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকে। আবার একজন ভেড়াওয়ালা বেদুইন লোকের থেকে উত্তম কেউ নেই, যে তার অতিথিকে খাবার ও আশ্রয় দেয় এবং তার অধিকার আদায় করে।” ২৩

আল্লাহর রাসূল ﷺ এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন, অতিথি আপ্যায়ন করা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। তিনি ﷺ বলেন, “কোনো অতিথিকে এক রাত থাকতে দেওয়া প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব। তাই কোনো অতিথি বা আগন্তুক যদি কারও আঙিনায় আসে, তবে সে (অতিথি) তার (বাড়ির মালিকের) ওপর ঋণ। সে (অতিথি) চাইলে তার অধিকার নিতে পারে, বা চাইলে সে তা ছেড়েও দিতে পারে।” ২৪

আসিম আবাদী রাহ. বলেন, “খাত্তাবি রাহ. বলেন, ‘অতিথিকে আপ্যায়ন করা, থাকতে দেওয়া এবং সম্মান করা মহৎ মানুষদের গুণ এবং সৎকর্মশীলদের অভ্যাস। যে

[২০] বুখারী (২৭৩৯)।

[২১] বুখারী (২৯১৬) ও মুসলিম (১৬০৩)।

[২২] বুখারী (৬০১৮) ও মুসলিম (৪৭)।

[২৩] আহমদ (১৯৮৮)।

[২৪] আবু দাউদ (৩৭৫০) এবং ইবনে মাজাহ (৩৬৭৭)।

অতিথিকে আপ্যায়ন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিল, সে নিন্দনীয় কাজ করল।” ২৯৫

একবার নবীজি ﷺ উসমান ইবনে মাসউনকে রাযি. বললেন, “তোমার অতিথির তোমার ওপর অধিকার রয়েছে।” ২৯৬

## মেজবানের আতিথেয়তার জীভা নবীজি ﷺ নির্ধারণ করে দিয়েছেন

আবু শুরায়হ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন, “যে-ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে যা দেওয়া উচিত, তা দিয়ে সম্মান করে।” তারা জিজ্ঞেস করল, ‘সেটি কী, আল্লাহর রাসূল?’ তিনি বললেন, “এক দিন-এক রাত বা তিন দিন আতিথেয়তা করা, এর অতিরিক্তটুকু তার জন্য সাদাকা। কোনো মুসলিমের জন্য জায়েজ নয় এত লম্বা সময় তার ভাইয়ের কাছে থাকা, যা তাকে পাপ করতে বাধ্য করে।” তারা জিজ্ঞেস করল, ‘আল্লাহর রাসূল, কীভাবে সে পাপ করতে বাধ্য করে?’ তখন তিনি ﷺ বললেন, “মেজবানের কাছে থাকার মাধ্যমে যখন কিনা তাকে দেওয়ার মতো কিছুই তার অবশিষ্ট থাকে না।” ২৯৭

এ থেকে জানা যায়, মেজবানের কাছে অতিথির থাকার সময়ের তিনটি স্তর রয়েছে—আবশ্যিক, প্রশংসনীয় এবং সাদাকাহ। আবশ্যিক হলো, নূন্যতম এক দিন এক রাত থাকা; প্রশংসনীয় হলো, তিন দিন; আর এর উপরে যেটুকু সময় থাকবে, সেটি মেজবানের জন্য সাদাকা।

তবে তিন দিনের বেশি থাকা মেজবানের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। রাসূল ﷺ বলেন, “তার কষ্ট বাড়িয়ে দেওয়ার পর তার কাছে থাকা জায়েজ নয়।” ২৯৮ অর্থাৎ, মেজবান যদি তিন দিনের বেশি থাকতে অনুরোধ না করে, তবে তিন দিনের বেশি তার বাসায় থাকা অতিথির জন্য জায়েজ নয়।

[২৯৫] আওন আল-মাবুদ (১৫৪/১০)।

[২৯৬] আবু দাউদ (১৩৬৯)।

[২৯৭] বুখারী (৬০১৯) ও মুসলিম (৪৮)।

[২৯৮] বুখারী (৬১৩৫)।



## নিজের ক্ষুধা ও কষ্টের সময়ও উদারতা দেখাতেন

মিকদাদ ইবনে আমর রাযি. বলেন, “একবার প্রচুর খাদ্য-সংকটে আমার ও আমার দুই সাথির দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি কমে যায়-যায় অবস্থা। তখন আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাহাবীদের কাছে এ-ব্যাপারে জানালাম। কিন্তু তাদের কেউ আমাদের কথা শুনলেন না। সবশেষে আমরা নবীজির ﷺ কাছে গেলাম। তিনি আমাদের সাথে নিয়ে তার পরিবারের কাছে গেলেন। সেখানে তিনটি বকরী ছিল। নবী ﷺ বললেন, “তোমরা দুধ দোহন করবে। এ-দুধ আমরা ভাগ করে পান করবো।” এরপর থেকে আমরা দুধ দোহন করতাম। আমাদের সবাই যার যার অংশ পান করতাম। আর আমরা নবীজির ﷺ অংশ তার জন্য তুলে রাখতাম। তিনি রাত্রে এসে এমনভাবে সালাম দিতেন, যেন ঘুমন্ত মানুষ উঠে না যায়, কিন্তু জাগ্রত লোক শুনতে পায়।

এরপর তিনি মসজিদে এসে সালাত আদায় করতেন। তারপর দুধ পান করতেন। একদা রাতে আমার কাছে শয়তান এলো। আমি আমার অংশ পান করে ফেলেছি। সে বলল, ‘মুহাম্মাদ ﷺ আনসারীদের কাছে গেলে তারা তাকে হাদিয়া দেবে এবং তাদের নিকটে তার এ-অল্প দুধের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যাবে।’ তখন আমি এসে সেটুকুও পান করে ফেললাম। দুধ যখন ভালোভাবে আমার পেটে ঢুকে গেল আমি বুঝলাম, এ-দুধ বের করার আর কোনো উপায় নেই, তখন শয়তান আমার থেকে দূরে সরে গিয়ে বলল, ‘তোমার ধ্বংস হোক, তুমি একি করলে! তুমি মুহাম্মাদের ﷺ ভাগের দুধ পান করে ফেলেছ? তিনি জাগ্রত হয়ে যখন তা পাবেন না, তখন তোমার উপর বদ-দুআ করবেন, তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। তোমার ইহকাল ও পরকাল ধ্বংস হয়ে যাবে।’

আমার শরীরে একটি চাদর ছিল। তা দিয়ে আমার পা ঢাকতে গেলে মাথা বের হয়ে যেত, আর মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত। ফলে কিছুতেই আমার ঘুম আসছিল না। আমার সাথি দুজন ঘুমিয়ে ছিল। তারা তো আমার মতো কাজ করেনি।

এরপর নবীজি ﷺ এসে যেভাবে সালাম করতেন, সেভাবেই সালাম করলেন। তারপর তিনি মসজিদে এসে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর দুধের নিকটে এসে ঢাকনা খুলে সেখানে কিছুই পেলেন না। এরপর তিনি মাথা আকাশের দিকে তুললেন। আমি তখন (মনে মনে) বললাম, এখনই হয়তো আমার উপর তিনি বদ দুআ করবেন, আর আমি নিঃশেষ হয়ে যাবো। তিনি বললেন, “হে আল্লাহ, যে-লোক আমার খাবারের



ব্যবস্থা করে তুমি তার খাদ্যের ব্যবস্থা কর। আর যে আমাকে পান করায়, তাকে তুমি পান করাও।”

তখন আমি চাদরটি নিয়ে গায়ে জড়ালাম এবং একটি ছুরি নিলাম, এরপর (এ ভেবে) বকরীগুলোর কাছে গেলাম যে, এদের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি মোটাতাজা, আমি সেটি রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য যবেহ করবো। সেখানে গিয়ে দেখলাম, সেটি দুধে পরিপূর্ণ এবং অন্যান্য সব বকরীও দুধে পূর্ণ। তখন আমি নবীজির ﷺ পরিবারের একটি বাসন নিয়ে এলাম, যার মধ্যে তারা দুধ দোহাতেন না। আমি তার মধ্যেই দুধ দোহন করলাম, তখন বাসনের উপরের অংশ ফেনা ভেসে উঠল।

এরপর আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গেলাম। তিনি বললেন, “তোমরা কি রাত্রের দুধ পান করেছ?” আমি বললাম, ‘আল্লাহর রাসূল, আপনি পান করুন।’ তিনি পান করে আমাকে দিলেন। আমি বললাম, ‘আল্লাহর রাসূল, আপনি পান করুন।’ তিনি পান করে আমাকে দিলেন। আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, নবীজি ﷺ পরিতৃপ্ত হয়ে গেছেন এবং আমি তার নেক দুআ পেয়ে গিয়েছি, তখন আমি খুশিতে হাসতে হাসতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। নবীজি ﷺ বললেন, “মিকদাদ, এটা তোমার কোনো মন্দ কাজ?” তখন আমি খুলে বললাম। তখন নবী ﷺ বললেন, “এটি একমাত্র আল্লাহর মেহেরবানি! তুমি কেন আমাকে জানালে না? আমরা আমাদের সঙ্গী দুজনকেও জাগাতাম, তা হলে তারাও এর অংশ পেত।” আমি তখন বললাম, ‘যে-মহান স্রষ্টা আপনাকে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, তার কসম, আপনি যখন পেয়েছেন এবং আমি যখন আপনার সঙ্গে ভাগ পেয়েছি, তখন আর কারও পাওয়া না পাওয়ার আমি তোয়াক্বা করি না।’”

রাসূল ﷺ মিকদাদসহ রাযি. আরও দুজন সাহাবীকে আপ্যায়ন করেছেন। এমনকি যখন তিনি দেখলেন, তাঁর অংশটুকুও খেয়ে ফেলা হয়েছে, তখন তিনি রেগে গিয়ে বদ দুআ না করে ভালো দুআ করেছেন। অপরদিকে মিকদাদ রাযি. রাসূলের ﷺ দুআ শোনার পর কালক্ষেপন না করে দ্রুত সে দুআ লাভের জন্য কাজে লেগে গেলেন। সাহাবীরা রাসূলের ﷺ দুআ লাভে এতটাই তৎপর ছিলেন।



## মেহমানদের সাথে বসে একসাথে হেসে গল্প করতেন

নবীজি ﷺ মুক্ত গোলাম সাওবান বলেন, “এক বেদুইন আমাদের কাছে অতিথি হিসেবে আসলেন। নবীজি ﷺ তার সঙ্গে ঘরের সামনে বসলেন। তিনি তাকে ইসলাম ও সালাতের ব্যাপারে মানুষের ভালোলাগা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে নবীজিকে ﷺ সুসংবাদ দিতে থাকল, একপর্যায়ে আমি নবীজির ﷺ মুখ (খুশিতে) উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখলাম। এরপর দুপুরে খাওয়ার সময় ঘনিয়ে এল। আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে ডেকে নিচু স্বরে বললেন, “আয়িশার বাড়িতে গিয়ে বলো, নবীজির একজন অতিথি এসেছে।” আয়িশা বললেন, ‘আল্লাহর কসম যিনি তাকে হেদায়াত ও সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, আমাদের বাসায় কারও জন্য কোনো খাবার নেই।’ এভাবে প্রত্যেক স্ত্রীর বাসা তিনি ﷺ আমাকে পাঠালেন এবং তারাও আয়িশার মতো একই কথা বললেন। শেষে নবীজির ﷺ চেহারা মলিন দেখতে পেলাম।

বেদুইন লোকটি বুদ্ধিমান ছিল, তিনি বুঝতে পেলেন কী ঘটছে। সে নবীজিকে ﷺ বলল, ‘আমরা মরুভূমির মানুষ কঠিন সময়ে অভ্যস্ত। শহরের মানুষের মতো আমরা নই। আমাদের একজনের জন্য কিছু খেজুর ও সামান্য দুধ যথেষ্ট, এটিই আমাদের জন্য উত্তম খাবার।’ সে যখন কথাগুলো বলছিল, সে-সময় সামরা নামের এক বকরী তাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। সেটার দুধ আগেই দোহন করা হয়ে গিয়েছে। নবীজি ﷺ সেটাকে “সামরা, সামরা” বলে নাম ধরে ডাকলেন। বকরীটা শব্দ করতে করতে তাঁর কাছে এলো। তিনি বকরীর পা ধরে ওলান ধরলেন, তারপর বললেন, “বিসমিল্লাহ।” তখন সেটার ওলান দুধে ভরে গেল। তিনি একটি পাত্র আনতে বললেন এবং “বিসমিল্লাহ” বলে দুধ দোহাতে শুরু করলেন। এরপর পাত্রটি ভরে ফেলে বললেন, “এটা “বিসমিল্লাহ” বলে তাকে দাও (পান করার জন্য)।”

আমি অতিথিকে দুধ দিলাম এবং তিনি অনেকখানি দুধ পান করলেন এবং রেখে দিতে চাইলেন। নবীজি ﷺ বললেন, “আবার পান করো।” তখন সে আবার পান করল এবং রেখে দিতে চাইল। নবীজি ﷺ বললেন, “আবার পান করো।” এভাবে তার পেট ভরে গেল। নবীজি ﷺ আবার “বিসমিল্লাহ” বলে দুধ দোহালেন এবং পাত্র ভরে ফেললেন। তারপর তিনি ﷺ বললেন, “এটা আয়িশার কাছে পাঠাও, সে যত খুশি যেন পান করে।”



নবীজি ﷺ আবার “বিসমিল্লাহ” বলে দুধ দোহালেন এবং পাত্র ভরে ফেললেন। এভাবে তাঁর সব স্ত্রীর কাছে পাঠালেন। প্রত্যেকবার তাঁর একেক স্ত্রী পান করত আর তিনি “বিসমিল্লাহ” বলে আরেকজনের কাছে পাঠাতেন। এভাবে তাঁর সব স্ত্রীর কাছে পাঠালেন এবং আমি ফিরে এলাম। তারপর তিনি ﷺ বললেন, “এটা আমাকে দাও।” আমি তাকে পাত্রটি দিলাম, তিনি আল্লাহ যতটুকু চাইলেন পান করলেন। এরপর তিনি আমাকে দিলেন এবং আমি পান করলাম এমন এক পানীয়, যা মধুর চেয়েও মিষ্টি এবং কস্তুরির থেকেও সুগন্ধ। নবীজি ﷺ এরপর দুআ করলেন, “আল্লাহ, এর (বকরীর) মালিকের ওপর রহমত বর্ষণ করো।” ৩০০

আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, “এক ব্যক্তি নবীজির ﷺ খেদমতে এসে বলল, ‘আল্লাহর রাসূল, দারিদ্র্য আমাকে জড়িয়ে ধরেছে।’ তিনি তাকে তাঁর স্ত্রীদের কাছে পাঠালেন। তাঁরা জানালেন, তাদের কাছে পানি ছাড়া কিছু নেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “কে আহ, যে এই ব্যক্তিকে মেহমান হিসেবে নিয়ে নিজের সাথে খাওয়াতে পার?” তখন এক আনসারী সাহাবী (আবু তালহা রাযি.) বললেন, ‘আমি।’ এ বলে তিনি মেহমানকে নিয়ে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, ‘রাসূলুল্লাহর ﷺ মেহমানকে সম্মান করা।’ স্ত্রী বললেন, ‘বাচ্চাদের খাবার ছাড়া আমাদের ঘরে অন্য কিছুই নেই।’ আনসারী বললেন, ‘তুমি আহার প্রস্তুত কর, বাতি জ্বালাও এবং বাচ্চারা খাবার চাইলে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দাও।’ সে বাতি জ্বালাল, বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়াল এবং সামান্য খাবার যা তৈরি ছিল, তা উপস্থিত করল। বাতি ঠিক করার বাহানা করে স্ত্রী উঠে গিয়ে বাতিটি নিভিয়ে দিলেন। তারপর তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনই অন্ধকারের মধ্যে আহার করার মতো শব্দ করতে লাগলেন এবং মেহমানকে বুঝাতে লাগলেন যে, তারাও সঙ্গে খাচ্ছেন। তারা দুজনেই সারা রাত অভুক্ত অবস্থায় কাটালেন।

ভোরে যখন তিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গেলেন, তখন তিনি ﷺ বললেন, আল্লাহ তোমাদের গত রাতের কাণ্ড দেখে হেসে দিয়েছেন; অথবা বলেছেন, খুশি হয়েছেন এবং এ আয়াত নাযিল করেছেন—“তারা অভাবগ্রস্ত সত্ত্বেও নিজেদের উপর অন্যদেরকে অগ্রগণ্য করে থাকে। আর যাদেরকে অন্তরের কৃপণতা হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলতাপ্রাপ্ত।” (আল কুরআন, ৫৯: ৯) ৩০১

[৩০০] আজুররির আশ-শরীয়াহ গ্রন্থ (১০৪৮)।

[৩০১] বুখারী (৩৭৯৮) ও মুসলিম (২০৫৪)।



নববী রাহ. বলেন, “এই হাদীসে নবীজি ﷺ ও তাঁর পরিবারের ক্ষুধা ও দারিদ্রের ঐর্ষ্য ধারণের বিবরণ উঠে এসেছে। এ থেকে দেখা যায়, সমাজের প্রধান কারও মেহমানদারিতে প্রথমে এগিয়ে আসবেন এবং নিজের সম্পদ থেকে খরচ করবেন। এরপর ভালো কাজে সহযোগিতা হিসেবে তিনি তার সাথীদের সাহায্য চাইতে পারেন। এ-হাদীস কষ্টের সময় একে অপরকে সাহায্য করার শিক্ষা দেয় এবং আনসার ও তার স্ত্রীর কষ্ট আমাদের অনুপ্রাণিত করে।” ৩০২

## কাফের হলেও মেহমানকে নবীজি ﷺ সম্মান করতেন

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, এক কাফের নবীজির ﷺ মেহমান হলো। নবীজি ﷺ তাঁর জন্য একটি ভেড়ার দুধ দোহন করার আদেশ দিলেন এবং লোকটি তা পান করল। তিনি ﷺ আবার দুধ দোহন করলেন, লোকটি আবার পান করল। এভাবে সে সাতটি ভেড়ার দুধ পান করল। পরদিন সকালে উঠে সে ইসলাম গ্রহণ করল। ৩০৩

## নবীজি ﷺ অতিথিদের নিজ হাতে খাবার পরিবেশন করতেন

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. বলেন, “(খন্দকের যুদ্ধে) পরিখা খনন করা হচ্ছিল, তখন আমি নবীজিকে ﷺ ভীষণ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম। তখন আমি আমার স্ত্রীর কাছে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তোমার কাছে কোনো কিছু আছে? আমি রাসূলুল্লাহকে ﷺ প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত দেখেছি।’ সে একটি চামড়ার পাত্র এনে তা থেকে এক ‘সা’ ৩০৪ পরিমাণ যব বের করে দিল। আমার বাড়িতে একটি বকরীর বাচ্চা ছিল। আমি সেটি যবেহ করলাম। আর সে (আমার স্ত্রী) যব পিষে দিল। আমি আমার কাজ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে সেও তার কাজ শেষ করল এবং গোশত কেটে কেটে ডেকচিতে ভরলাম।

এরপর আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে ফিরে চললাম। তখন সে (স্ত্রী) বলল,

[৩০২] মুসলিম গ্রন্থের (১২/১৪) ব্যাখ্যায় নববী (রাহ.)।

[৩০৩] বুখারী (৫৩৯৭) ও মুসলিম (২০৬৩)।

[৩০৪] এক সা’ হল ৩ কেজি ১৮৪.২৭২ গ্রাম সমপরিমাণ।

‘আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের নিকট লজ্জিত করবেন না।’ এরপর আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে চুপে চুপে বললাম, ‘আল্লাহর রাসূল, আমরা আমাদের একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করেছি এবং আমাদের ঘরে এক সা যব ছিল, তা আমার স্ত্রী পিষে দিয়েছে। আপনি আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আসুন।’ তখন নবী ﷺ উচ্চঃস্বরে সবাইকে বললেন, “হে পরিখা খননকারীরা, জাবির খানার ব্যবস্থা করেছে। এসো, তোমরা সকলেই চলা।” এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “আমার যাওয়ার আগে তোমাদের ডেকাচি নামাবে না এবং খামির থেকে রুটিও তৈরি করবে না। আমি (বাড়িতে) এলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ সব সাহাবাদের নিয়ে এলেন। এরপর আমি আমার স্ত্রীর কাছে এলে সে বলল, ‘আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।’ আমি বললাম, ‘তুমি যা বলেছ, আমি তা-ই করেছি।’

এরপর সে রাসূলুল্লাহর ﷺ সামনে আটার খামির বের করে দিলে তিনি তাতে মুখের লালা মিশিয়ে দিলেন এবং বারাকাতের জন্য দুআ করলেন। এরপর তিনি ডেকাচির কাছে এগিয়ে গেলেন এবং তাতে মুখের লালা মিশিয়ে এর জন্য বারাকাতের দুআ করলেন। তারপর বললেন, “রুটি প্রস্তুতকারিণীকে ডাকো। সে আমার কাছে বসে রুটি প্রস্তুত করুক এবং ডেকাচি থেকে পেয়ালা ভরে গোশত বেড়ে দিক। তবে (উনুন হতে) ডেকাচি নামাবে না।”

তারা ছিলেন সংখ্যায় এক হাজার। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তাঁরা সকলেই তৃপ্তি সহকারে খেয়ে বাকি খাদ্য রেখে চলে গেলেন। অথচ আমাদের ডেকাচি আগের মতই টগবগ করছিল আর আমাদের আটার খামির থেকেও আগের মতোই রুটি তৈরি হচ্ছিল।” ৩০৫

মুহাজির এবং আনসাররা মূলত এ-ঘটনায় নবীজির ﷺ অতিথি ছিলেন—যদিও খাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল জাবিরের রাযি. ঘরে। কারণ খাবার পরিমাণে বেড়ে গিয়ে সবার জন্য যথেষ্ট হওয়া—এ-ঘটনা নবীজির ﷺ মুজিয়া ছিল; কারণ জাবির রাযি. এর খাদ্য গুটি কয়েকজনের জন্য যথেষ্ট ছিল। যেভাবে নবীজি ﷺ সবাইকে নিজ হাতে খাবার পরিবেশন করলেন, তা মেহমানদারিতার উদার দৃষ্টান্ত।



## মেহমান হিসেবে যেমন ছিলেন নবীজি ﷺ

নবীজি ﷺ অতিথি হিসেবে যথেষ্ট বিনয়ী ছিলেন। অনেক ছোট উপলক্ষ্যেও তাঁকে দাওয়াত করলে তিনি তা কবুল করতেন। তিনি ﷺ বলতেন, “আমাকে হালাল পশুর পায়া বা কাঁধ যেটিই খেতে দাওয়াত দেয়া হোক, তবু তা আমি কবুল করব।” ৩০৬

ইবনে হাজার রাহ. বলেন, “নবীজি ﷺ দুই অংশের কথাই বলেছেন। এখানে কাঁধের মাংস তাঁর পছন্দনীয় ছিল, আর পায়ের মাংস তাঁর কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।” ৩০৭

রাসূল ﷺ যে কারও দাওয়াত কবুল করতেন। এমনকি তিনি এক কিশোরের দাওয়াতও কবুল করেছিলেন। আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, “এক দরজি বালক খাবার তৈরি করে আল্লাহর রাসূলকে ﷺ দাওয়াত করল। সে আল্লাহর রাসূলের ﷺ সামনে রুটি আর ঝোল দিল, যাতে লাউ ও গোশতের টুকরা ছিল। তারপর সে কাজে ফিরে গেল। আমি নবীকে ﷺ দেখতে পেলাম, পেয়ালার কিনারা হতে তিনি লাউয়ের টুকরা খুঁজে নিয়ে খাচ্ছেন। সে-দিন হতে আমি সব সময় লাউ ভালোবাসি।” ৩০৮

এ-হাদীস থেকে শেখা যায় যে, উচ্চপদস্থ হলেও সমাজের কোনো নিচু শ্রেণির কেউ দাওয়াত দিলে তা কবুল করা উচিত। রাসূল ﷺ যে-কারও দাওয়াত কবুল করতেন। এর আরেকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এক ইহুদীর ঘটনায়। আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, “এক ইহুদি নবীজিকে দাওয়াত দিয়ে পাউরুটি আর তেল বা চর্বি খেতে দিল যার গন্ধ বদলে গিয়েছিল। তিনি তার দাওয়াত কবুল করেছিলেন।” ৩০৯

রাসূলের ﷺ সাথে হঠাৎ কেউ দাওয়াতে চলে এলে তার জন্য মেজবানের কাছে দাওয়াতের আবেদন জানাতেন। আবু মাসউদ আল-আনসারী রাযি. থেকে বর্ণিত, আবু শুয়াইব রাযি. নামক এক আনসারীর একজন গোশত-বিক্রেতা গোলাম ছিল। একদিন আবু শুয়াইব রাযি. তাকে বললেন, ‘আমার জন্য পাঁচজন লোকের খাবার তৈরি করো। আমি আশা করছি, নবীজিকে ﷺ দাওয়াত করব। সেই পাঁচজনের মধ্যে তিনি নিজে

[৩০৬] বুখারী (২৫৬৮)।

[৩০৭] ফাতহুল বারী (১৯৯/৫)।

[৩০৮] বুখারী (২০৯২) ও মুসলিম (২০৪১)।

[৩০৯] আহমদ (১৩৭৮৯)।

ছিলেন একজন। তিনি নবীজির ﷺ চেহারা মুখার ছাপ লক্ষ করেছিলেন। কাজেই তিনি তাঁকে ﷺ দাওয়াত করলেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আরেকজন লোক এলেন, যাকে দাওয়াত করা হয়নি। তখন নবী ﷺ (আনসারীকে) বললেন, “সে আমাদের পিছে পিছে চলে এসেছে। তুমি কি তাকে অনুমতি দেবে? নাহলে সে চলে যাবে।” তিনি বললেন, ‘আমি বরং অনুমতি দিচ্ছি, আল্লাহর রাসূল!’ ৩১০

## মাঝে মাঝে নিজেই কিছু জাহাযীর বাগায় মেহমান হিগেবে যেতেন

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, “এক দিন রাসূল ﷺ আবু বাকর ও উমারকে রাযি. দেখতে পেলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, “এ-সময় কীসে তোমাদের ঘর থেকে বের করে এনেছে?” তারা বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল, ক্ষুধার যন্ত্রণা।’ তিনি ﷺ বললেন, “যে-মহান আল্লাহর হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম, যা তোমাদের বের করে এনেছে, আমাকেও তা-ই বের করে এনেছে, চলো।” তারা উভয়ে তার সাথে চলতে লাগলেন। তারপর তিনি এক আনসারীর ৩১১ গৃহে এলেন, তখন তিনি বাড়িতে ছিলেন না। তার সহধর্মিণী তাঁকে দেখে বললেন, ‘স্বাগতম!’ রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “অমুক কোথায়?” স্ত্রীলোকটি বলল, ‘তিনি আমাদের জন্য খাবার পানি আনতে গিয়েছেন।’

তখন আনসারী ব্যক্তিটি এসে রাসূল ﷺ ও তাঁর দুই সাথিকে দেখতে পেয়ে বললেন, ‘আল্লাহর প্রশংসা, আজ মেহমানের দিক হতে আমার থেকে সৌভাগ্যবান আর কেউ নেই।’ তারপর তিনি গিয়ে একটি খেজুরের ছড়া নিয়ে আসলেন। তাতে কাঁচা, পাকা ও শুকনা খেজুর ছিল। তিনি বললেন, ‘আপনার এ ছড়া থেকে খান।’

এরপর তিনি ছুরি নিলেন (ছাগল যবেহ করার জন্য)। তখন রাসূল ﷺ তাকে বললেন, “সাবধান, দুধওয়ালা বকরী যবেহ করো না।” তারপর তাদের জন্য (বকরী) যবেহ করলে তারা বকরীর গোশত ও কাঁদির খেজুর খেলেন এবং (মিঠা) পানি পান করলেন। তারা সকলে ক্ষুধা মিটালেন ও পরিতৃপ্ত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আবু বাকর

[৩১০] বুখারী (২৪৫৬) ও মুসলিম (২০৩৬)।

[৩১১] তিরমিযীর বর্ণনামতে (২৩৬৯) তার নাম আবু হাইসাম ইবনে আত-তায়িহান।



ও উমারকে রাযি. বললেন, “যে-সত্তার হাতে আমার জীবন, তার কসম, কিয়ামাতের দিন এ নিয়ামাত সম্বন্ধে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে। ক্ষুধা তোমাদের বাড়ি হতে বের করে এনেছে, অথচ তোমরা এ নিয়ামাত লাভ না করে ফিরে যাওনি।” ৩১২

লাকিত ইবনে সাবরাহ রাযি. বলেন, “রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে আগত বনু মুনতফিক গোত্রের প্রতিনিধি দলটির নেতা ছিলাম আমি (অথবা বলেন, আমি তাঁদের মধ্যেই ছিলাম)। আমরা যখন রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে পৌঁছলাম, তখন তাঁকে তাঁর ঘরে পেলাম না, অবশ্য উম্মুল মুমিনীন আয়িশাকে রাযি. পেলাম। তিনি আমাদের জন্য ‘খাযিরা’ (একপ্রকার খাদ্য) তৈরির আদেশ দিলেন। আমাদের জন্য তা তৈরি করা হলো এবং আমাদের সামনে কিনা (অর্থাৎ খেজুরভর্তি একটি পাত্র) পেশ করা হলো। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনারা কি কিছু খেয়েছেন?” অথবা তিনি বললেন, “আপনাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে?” আমরা বললাম, ‘হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল!’ আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় এক রাখাল বকরীর পাল খোঁয়াড়ে নিয়ে এলেন। সাথে একটি বকরীর বাচ্চা ছিল, সেটি চিৎকার করছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, “ওহে অমুক, কী বাচ্চা জন্ম দিয়েছে?” সে বলল, ‘মাদি।’ তিনি বললেন, “সেটির পরিবর্তে আমাদের জন্য একটি বকরী যবেহ করো।” তারপর (প্রতিনিধি দলের নেতাকে উদ্দেশ্য করে) বললেন, “এমনটি মনে করবেন না যে, বকরীটি আপনাদের জন্যই যবেহ করছি; বরং আমাদের কাছে একশটি বকরী আছে। তাই আমরা এর সংখ্যা আর বাড়াতে চাই না। সেজন্যই কোনো বাচ্চা জন্ম হলে আমরা সেটির পরিবর্তে আরেকটি বকরী যবেহ করি।” ৩১৩

আয়নী রাহ. বলেন, “এ-হাদীসের শিক্ষা হলো, বাসায় অতিথি এলে বাসার মানুষের উচিত পরিবারের কর্তার অপেক্ষা না করে তাদের কিছু খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করা। এ থেকে এটাও শিক্ষা পাওয়া যায়, মেজবানের উচিত তাদের সর্বোৎকৃষ্টা দিয়ে মেহমানদারি করা।” ৩১৪

[৩১২] মুসলিম (২০৩৮)।

[৩১৩] আবু দাউদ (১৪২)।

[৩১৪] আবু দাউদ গ্রন্থের (৩৩৫/১) ব্যাখ্যায় আয়নী (রাহ.)।

## উপগাহার

নবীজি মুহাম্মদ ﷺ ক্রমাগত তাঁর সাহাবীদের আল্লাহর প্রতি এবং একে অপরের প্রতি দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। একজন বিশ্বাসী কখনোই তার ভাইকে অভুক্ত-ক্ষুধার্ত রেখে শান্তিতে থাকতে পারে না। তিনি ﷺ তাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, একজন বিশ্বাসী তার ভাই বা বোনকে ক্ষুধার্ত দেখতে বা দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার মধ্যে বাস করতে দেখে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না।

অতিথি, প্রতিবেশী ও অন্যদের মাঝে আতিথেয়তা করে সাওয়াব অর্জনের অসংখ্য সুযোগ একজন মুসলিমের রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত রাসূলের ﷺ পদাঙ্ক অনুসরণে আমরা আজ পিছিয়ে পড়েছি।



## ষষ্ঠ অধ্যায়

### সাহাবীদের সাথে যেমন ছিলেন নবীজি ﷺ

উন্মাতের মাঝে নবীজির ﷺ সাহাবীদের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। কারণ, তারা এ-উন্মাহর সবচেয়ে বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী, নিরহংকার এবং সর্বোচ্চ হেদায়েতপ্রাপ্ত মানুষ ছিলেন। এজন্য আল্লাহ তাদেরকে রাসূলের ﷺ সাহাবী হিসেবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য বেছে নিয়েছিলেন।

আল্লাহ কুরআনের বহু আয়াতে তাঁদের প্রশংসা করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন—“মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম সারির অগ্রগামী আর যারা তাদেরকে যাবতীয় সৎকর্মে অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তাদের জন্য তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটিই হলো মহান সফলতা।” (আল কুরআন, ৯:১০০)

নবীজির ﷺ সাহাবীগণের মাঝে মর্যাদায় ভিন্নতা ছিল। এ-সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেছেন, “সাহাবা শব্দটি এমন কাউকে নির্দেশ করে, যিনি রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে থেকেছেন—হোক সেটি স্বল্প সময় বা দীর্ঘ সময়। ঈমান এনে তাদের কেউ তাঁর সাথে এক বছর, কেউ এক মাস, কেউবা এক ঘণ্টা সময় কাটিয়েছেন; কিংবা তাঁকে কেবল কিছু সময়ের জন্য দেখেছেন। তাঁর সাথে সাহচর্যের পরিমাণের ওপর তাদের মর্যাদা নির্ভর করে।” ৩১৫

এ-অধ্যায়ে আমাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হলো রাসূলের ﷺ চারপাশের ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের সাথে তাঁর আচরণ কেমন ছিল। তাদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন—আবু বাকর, উমার, উসমান, আলী, যুযায়ের, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হুযাইফা ইবনে

আল ইয়ামান এবং আব্দুর রহমান ইবনে আউফ।

তাদের মধ্যে আবু বাকর ও উমার রাযি. ছিলেন নবীজির ﷺ সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। আলি রাযি. বলেন, ‘আমি অনেকবার নবীজিকে ﷺ বলতে শুনেছি, “আমি, আবু বাকর ও উমার গেলাম”, “আমি, আবু বাকর ও উমার ঢুকলাম”, “আমি, আবু বাকর ও উমার বের হলাম” ইত্যাদি।’ ৩১৬

## নবীজি ﷺ প্রকাশ্যে তাদের প্রতি ভালোবাসা জানিয়েছেন

আমর ইবনে আল-আস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ তাকে যাতুস সালাসিলের যুদ্ধে সেনাবাহিনীর সেনাপতি হিসেবে পাঠালেন। তিনি বলেন, ‘আমি তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘মানুষের মধ্যে আপনার কাছে কে সবচেয়ে প্রিয়?’ তিনি ﷺ জবাব দিলেন, “আয়িশা।” আমি বললাম, ‘পুরুষদের মধ্য থেকে?’ তিনি ﷺ বললেন, “তার বাবা।” আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘তারপর কে?’ তিনি ﷺ বললেন, “তারপর উমার ইবনে খাত্তাব।” ৩১৭

## সাহাবীদের সম্পর্কে কষ্টকথা নবীজি ﷺ গত্য করতেন না

আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, “খালিদ ইবনে আল-ওয়ালিদ এবং আব্দুর রাহমান ইবনে আওফের মাঝে একবার বিরোধ বাধল। খালিদ তাকে গালি দিলেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, “তোমরা আমার সাহাবীদের গালমন্দ করো না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বত পরিমাণ সোনা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো, তবুও তাদের এক মুদ ৩১৮ বা অর্ধ মুদের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে না।” ৩১৯

“আমার সাহাবী”—বলতে নবীজি ﷺ তার সবচেয়ে কাছের সাহাবীদের

[৩১৬] বুখারী (৩৬৮৫) ও মুসলিম (২৩৮৯)।

[৩১৭] বুখারী (৩৬৬২) ও মুসলিম (২৩৮৪)।

[৩১৮] মুদ একটি পরিমাণের একক। একটি নির্দিষ্ট আকারের পাত্রের পরিমাণকে মুদ বলা হয়। যার আনুমানিক পরিমাণ দুই হাত মুনাযাতের মত একত্রিত করে তাতে যতটুকু ফসল নেয়া যায়।

চার মুদ = ১ সা'। (এক সা' হল ৩ কেজি ১৮৪.২৭২ গ্রাম সমপরিমাণ।) - সম্পাদক

[৩১৯] বুখারী (৩৬৭৩) ও মুসলিম (২৫৪১)।



বুঝিয়েছেন—যারা মক্কা বিজয়ের আগে মুসলিম হয়েছেন, তাঁকে দীর্ঘ সময় সঙ্গ দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন, তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছেন, সাদাকা করেছেন এবং হিজরত করেছেন। তাই মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে অগ্রবর্তী সাহাবীগণ পরবর্তী সাহাবীদের তুলনায় উত্তম। এই বিষয়টি রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে খালিদ ইবনে ওয়ালিদের কথাপোকথন থেকে বোঝা যায়। তিনিও সে-সময় সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

ইবনে হাজার রাহ. বলেন, “নবীজি ﷺ পরবর্তী কিছু সাহাবীদের নিষেধ করেছিলেন, তারা যেন পূর্ববর্তী সাহাবীদের গালি না দেয়। এ থেকে বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহর ﷺ পরের প্রজন্মের মুসলিমদের জন্য সাহাবীদের সম্পর্কে মন্দ কিছু বলা আরও বেশি দূষণীয়।” ৩২০

এখানে খালিদ ইবনে আল-ওয়ালিদ ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম, যারা হুদাইবিয়া যুদ্ধের পর মুসলিম হয়েছিলেন, তাদেরকেই নবীজি ﷺ এভাবে বলেছিলেন। তা হলে যারা সাহাবী না হয়েও তাদের সম্পর্কে বাজে কথা বলে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ কীভাবে বলতেন বলে আপনার মনে হয়?

## ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের সম্মান করতেন

আবু দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমি নবীজির ﷺ কাছে বসে ছিলাম। এমন সময় আবু বাকর রাযি. তার পরনের কাপড়ের একপাশ এমনভাবে ধরে আসলেন যে, তার দু’ হাঁটু বেরিয়ে পড়ছিল। নবী ﷺ বললেন, “তোমাদের এ-সাথি এই মাত্র কারও সঙ্গে ঝগড়া করে আসছে।” তিনি সালাম করলেন এবং বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল, আমার এবং উমার ইবনে খাত্তাবের মাঝে একটি বিষয়ে কিছু কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। আমিই প্রথমে কটু কথা বলেছি। এরপর আমি লজ্জিত হয়ে তার কাছে মাফ চেয়েছি। কিন্তু তিনি মাফ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এখন আমি আপনার নিকট হাজির হয়েছি।’

নবী ﷺ বললেন, আল্লাহ তোমাকে মাফ করবেন, হে আবু বাকর রাযি.! এ-কথাটি তিনি তিনবার বললেন। এরপর উমার রাযি. লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আবু বাকরের রাযি. বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আবু বাকর কি বাড়িতে আছেন?’ তারা বলল,



‘না’। তখন উমার রাযি. নবীজির ﷺ কাছে গেলেন। (তাকে দেখে) নবীজির ﷺ চেহারা রক্তবর্ণ হয়ে গেল। আবু বাকর রাযি. ভীত হয়ে নতজানু হয়ে বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল, আমিই প্রথমে অন্যায করেছি।’ এ-কথাটি তিনি দু বার বললেন। তখন নবী ﷺ বললেন, ‘আল্লাহ যখন আমাকে তোমাদের কাছে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছিলেন, তখন তোমরা সবাই বলেছ, ‘তুমি মিথ্যা বলছ’ আর আবু বাকর বলেছে, ‘আপনি সত্য বলছেন’; তার জান-মাল সব কিছু দিয়ে আমাকে সহানুভূতি দেখিয়েছে। তোমরা কি আমার সম্মানে আমার সাথিকে অব্যাহতি দেবে না?’ এ-কথাটি তিনি দু বার বললেন। এরপর আবু বাকরকে রাযি. আর কখনো কষ্ট দেয়া হয়নি। ৩৩

রাবীআ আল-আসলামী রাযি. থেকে বর্ণিত; “রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ও আবু বাকরকে রাযি. এক খণ্ড জমি দিয়েছিলেন। তারপর একসময় দুনিয়ার চাকচিক্য এলো। ফলে একটি খেজুরের কাঁদিকে কেন্দ্র করে আমরা বিতর্কে জড়িয়ে পড়লাম। আবু বাকর রাযি. বললেন, ‘এটা আমার জমির সীমানার মধ্যে।’ আমি বললাম, ‘না, এটা আমার জমিতে।’ (এ বিষয়ে) আমার ও আবু বাকরের রাযি. মধ্যে কথা কাটাকাটি হলো। আবু বাকর রাযি. আমাকে এমন একটি কথা বললেন, যেটি আমি অপছন্দ করলাম। এজন্য তিনি অনুতপ্ত হয়ে আমাকে বললেন, ‘রাবীআ, তুমি অনুরূপ কথা বলে প্রতিশোধ নিয়ে নাও, যাতে সেটার বদলা হয়ে যায়।’ আমি বললাম, ‘না, আমি তা করব না।’ তখন আবু বাকর রাযি. বললেন, ‘তুমি অবশ্যই বলবে, নতুবা তোমার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে সাহায্য প্রার্থনা করব (অর্থাৎ নালিশ করব)।’ আমি বললাম, ‘আমি এটা করতে পারব না।’ রাবীআ বলেন, তিনি জমি প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানালে আবু বাকর রাযি. আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে গেলেন। আমিও তার পিছু পিছু গেলাম।

এরই মধ্যে আসলাম গোত্রের কিছু লোক এসে বলল, ‘আল্লাহ আবু বাকরের রাযি. উপর রহম করুন! তিনি তোমার বিরুদ্ধে রাসূলের ﷺ-এর নিকট নালিশ করছেন! অথচ তিনিই যা ইচ্ছা তা-ই তোমাকে বলেছেন!’ আমি বললাম, ‘তোমরা জানো না, তিনি কে? ইনিই হচ্ছেন আবু বাকর সিদ্দীক (দুজনের ২য় জন)! তিনি মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সুতরাং, তোমরা তার ব্যাপারে (কথা বলায়) সতর্ক থাকো। তিনি হয়তো দেখে ফেলবেন যে, তোমরা আমাকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করছ। ফলে তিনি রেগে যাবেন এবং রাসূলের ﷺ কাছে চলে যাবেন। অতঃপর তাঁর ক্রোধের কারণে



রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্রোধান্বিত হবেন। আর তাদের দুজনের ক্রোধের কারণে আল্লাহ ক্রোধান্বিত হবেন। তখন রাবীআ ধ্বংস হয়ে যাবো।’ তারা বলল, ‘তা হলে তুমি আমাদের কী করার নির্দেশ দিচ্ছ?’ আমি বললাম, ‘তোমরা ফিরে যাও।’

আবু বাকর রাযি. রাসূলুল্লাহর ﷺ বাড়িতে গিয়ে তাঁর কাছে পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। তারপর তিনি আমার দিকে মাথা উঁচু করে বললেন, “রাবীআ, তোমার ও আবু বাকরের রাযি. মধ্যে কী ঘটেছে?” আমি বললাম, ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ, ঘটনা ছিল এরূপ এরূপ। একপর্যায়ে তিনি আমাকে এমন কথা বললেন, যা আমার অপছন্দনীয় ছিল। ফলে তিনি আমাকে বললেন, ‘আমি তোমাকে যেমন বলেছি, তুমি আমাকে তেমন বলো, যাতে সেটার বদলা হয়ে যায়।’ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “হ্যাঁ, তুমি তার জবাব দেবে না। বরং বলবে, ‘আবু বাকর, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিন। হে আবু বাকর, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিন।’ (এটা শুনে) আবু বাকর রাযি. কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন।” ৩২২

## অন্য সাহাবীদের তুলনায় ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের বেশি প্রাধান্য দিতেন

আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, “নবীজি ﷺ তাঁর মৃত্যুর কিছু কাল আগে একটি খুতবা দিতে গিয়ে বললেন, “আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুটি বিষয়ের একটি বেছে নেওয়ার অধিকার দিয়েছেন। একটি হলো দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, আরেকটি হলো আল্লাহর নিকট যা রক্ষিত রয়েছে। তখন সে-বান্দা আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা-ই পছন্দ করলেন।”

এ-কথা শুনে আবু বাকর রাযি. কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, “আমাদের পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক!” তার অবস্থা দেখে আমরা অবাক হলাম। লোকেরা বলতে লাগল, ‘এ বৃদ্ধের অবস্থা দ্যাখো! রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বান্দা সম্বন্ধে খবর দিলেন যে, তাকে আল্লাহ ভোগ-সম্পদ দিয়েছে এবং তার কাছে যা রয়েছে, এ-দুয়ের মধ্যে বেছে নিতে বললেন আর এই বৃদ্ধ বলছে, আপনার জন্য আমাদের মাতাপিতা উৎসর্গ করলাম!’

রাসূলুল্লাহই ﷺ হলেন সেই ইখতিয়ারপ্রাপ্ত বান্দা। আর আবু বাকরই রাযি.-ই

হলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “যে-ব্যক্তি তার সঙ্গ ও সম্পদ দিয়ে আমার প্রতি সবচেয়ে ইহসান করেছেন, তিনি হলেন আবু বাকর রাযি। যদি আমি আমার উম্মতের কোনো ব্যক্তিকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তা হলে আবু বাকরকেই করতাম। তবে তার সঙ্গে আমার ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক রয়েছে। মসজিদের দিকে আবু বাকরের রাযি। দরজা ছাড়া অন্য কারও দরজা খোলা থাকবে না।” ৩২৩

ইবনে হাজার রাহ. বলেন, “আবু বাকর রাযি. বুঝতে পেরেছিলেন যে, এতে নবীজির ﷺ মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।” ৩২৪

## অন্যদের চেয়ে জাহাবীদের প্রতি বেশি গহনশীল ছিলেন

উমার ইবনে খাত্তাব রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, “(মুনাফিক-সর্দার) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল মারা গেলে তার জানাযার সালাতের জন্য আল্লাহর রাসূলকে ﷺ আহ্বান করা হলো। আল্লাহর রাসূল ﷺ (সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে) দাঁড়ালে আমি দ্রুত তাঁর নিকট গিয়ে বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল, আপনি ইবনে উবাইয়ের জানাযার সালাত আদায় করতে যাচ্ছেন? অথচ সে অমুক অমুক দিন (আপনার এবং ঈমানদারদের সম্পর্কে) এই এই কথা বলেছে! এ বলে আমি তার উক্তিগুলো গুণেগুণে পুনরাবৃত্তি করলাম।’ আল্লাহর রাসূল ﷺ মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, “উমার, সরে যাও!” আমি বারবার আপত্তি করলে তিনি বললেন, “আমাকে (তার সালাত আদায় করার ব্যাপারে) সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কাজেই আমি তা গ্রহণ করলাম। আমি যদি জানতাম যে, সন্তরবারের অধিক মাগফিরাত কামনা করলে তাকে মাফ করা হবে, তা হলে আমি অবশ্যই তার চেয়ে অধিক বার মাফ চাইতাম।”

তারপর আল্লাহর রাসূল ﷺ তার জানাযার সালাত আদায় করে ফিরে এলেন। এর কিছুক্ষণ পরেই সূরা বারআতের ৩২ এ-দুটি আয়াত নাযিল হলো—“তাদের কেউ মারা গেলে আপনি কখনো তার জানাযার সালাত আদায় করবেন না। এমতাবস্থায় যে, তারা

[৩২৩] বুখারী (৩৯০৪) ও মুসলিম (২৩৮২)।

[৩২৪] ফাতহুল বারী (১২/৭)।

[৩২৫] সূরা তাওবা কে সূরা বারআত ও বলা হয়।



ফাসিকা” (আল কুরআন, ৯:৮৪)

উমার বলেন, আল্লাহর রাসূলের সামনে আমার ঐ দিনের দুঃসাহসিক আচরণে আমি নিজেই বিস্মিত হয়েছি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই এ-ব্যাপারে অধিক অবগত।” ৩২৬

ইবনে হাজার রাহ. বলেন, “এভাবেই নবীজি ﷺ সেই পরিস্থিতিতে উমার রাযি.-এর কথায় সহনশীল ছিলেন এবং তিনি তার দিকে ফিরে মুচকি হেসেছিলেন।” ৩২৭

## ব্যক্তিগত বিষয়েও সাহাবীদের ওপর আস্থা রাখতেন

নবীজি ﷺ বিলাল ইবনে রাবাহর রাযি. ওপর তাঁর খরচ দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

আবদুল্লাহ আল-হাওয়ানীর রাযি. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, “একদা হালব শহরে আমার সাথে রাসূলুল্লাহর ﷺ মুয়াযযিন বিলালের রাযি. দেখা হলো। আমি বললাম, ‘হে বিলাল, রাসূলুল্লাহর ﷺ পরিবারে ভরণ-পোষণের খরচ কীভাবে ব্যবস্থা হতো, আমাকে বলুন।’ তিনি বললেন, ‘মহান আল্লাহ নবীজিকে ﷺ (রাসূল করে) পাঠানোর পর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাঁর পরিবারের যাবতীয় বিষয়ের দায়িত্বে ছিলাম। তাঁর কাছে কোনো বস্ত্রহীন মুসলিম এলে তিনি আমাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতেন এবং আমি ধার করতে বের হতাম। আমি তাঁর জন্য কাপড় কিনে এনে তাঁকে পরিয়ে দিতাম এবং আহার করাতাম। এমতাবস্থায় মুশরিক সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি এসে আমাকে বলল, ‘বিলাল, আমার অনেক সম্পদ রয়েছে। তুমি অন্য কারও কাছ থেকে ধার না করে আমার কাছ থেকে ধার নাও। সুতরাং আমি তা-ই করলাম।’

এ-অবস্থায় আমি একদিন উযু করে সালাতের আযান দিতে উঠি। এ-সময় মুশরিক লোকটি একদল ব্যবসায়ীর সাথে এসে উপস্থিত হলো। সে আমাকে দেখামাত্র বলল, ‘হে হাবশি!’ আমি বললাম, ‘উপস্থিত আছি।’ সে আমাকে কটুক্তি করাতে আমার মনে খুব বিঁধল। সে আমাকে আরও বলল, ‘তুমি কি জানো, মাসের কত দিন বাকি আছে?’ আমি বললাম, ‘প্রায় শেষ।’ সে বলল, ‘তোমার ও তার (ঋণ পরিশোধের সময়ের) মধ্যে চার দিন ব্যবধান। কাজেই আমি তোমাকে ঋণের পরিবর্তে ধরে নিয়ে যাব এবং

[৩২৬] বুখারী (১৩৬৬) ও মুসলিম (২৪০০)।

[৩২৭] ফাতহুল বারী (৩৩৫/১)।



মেষপালের রাখাল বানিয়ে তোমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব।’ তার একরূপ কথা শুনে আমি মর্মান্বিত হলাম, যেমন অন্যান্য লোকদের হয়ে থাকে। আমি যখন ইশার সালাত আদায় করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিজনের কাছে ফিরে এলেন। আমি তাঁর সাথে দেখা করার অনুমতি চাইলে তিনি তা অনুমতি দিলেন।

আমি বললাম, ‘আল্লাহর রাসূল, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আমি যে-মুশরিক ব্যক্তির কাছ থেকে ধার নিয়েছিলাম, সে আমাকে এ-কথা বলেছে। আমার এ-ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য আপনারও নেই, আমারও নেই। সে আমাকে অপদস্থ করবে। কাজেই ইতোপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছে এরূপ কোনো মুসলিম জনপদে পলায়ন করার অনুমতি আমাকে দিন। আমি তত দিন আত্মগোপন থাকার অনুমতি চাই, যত দিন না মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ﷺ এ-সম্পদের ব্যবস্থা করে দেন, যা দিয়ে আমার ঋণ পরিশোধ হবে।’ এ-কথা বলে আমি আমার ঘরে চলে এসে আমার তরবারি, মোজা, জুতা ও ঢাল গুছিয়ে আমার মাথার কাছে রাখি। ইচ্ছা ছিলো, ভোরের আভা ফোঁটামাত্রই বেরিয়ে পড়ব।

হঠাৎ এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে আমাকে বলল, ‘বিলাল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে স্মরণ করেছেন।’ আমি রওনা হয়ে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়ে দেখি, চারটি উট পিঠে সম্পদ বোঝাই করে নিয়ে বসে আছে। আমি অনুমতি চাইলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, “সুসংবাদ গ্রহণ করো! মহান আল্লাহ তোমার ঋণ পরিশোধের জন্য এগুলো পাঠিয়েছেন।” পুনরায় তিনি বললেন, “তুমি কি দেখছ না চারটি উট মাল বোঝাই হয়ে বসে আছে?” আমি বললাম, ‘হ্যাঁ।’ তিনি বললেন, “এই উট এবং এদের পিঠে বোঝাই সম্পদ তোমার জন্য। এগুলো—পিঠ বোঝাই বস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য ফাদাকের শাসক আমার জন্য পাঠিয়েছে। এগুলো নিয়ে তোমার ঋণ পরিশোধ করো।’ আমি তা-ই করলাম।

তারপর বিলাল বলেন, ‘আমি মসজিদে গিয়ে দেখি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে আছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি বললেন, “তুমি যে সম্পদ পেয়েছ, তা কী করেছ? ঋণ পরিশোধ হয়েছে কি?” আমি বললাম, ‘মহান আল্লাহ রাসূলের ﷺ সমস্ত ঋণ পরিশোধের তাওফীক দিয়েছেন। এখন আর অবশিষ্ট নেই।’ তিনি বললেন, “কিছু সম্পদ অবশিষ্ট আছে?” আমি বললাম, ‘হ্যাঁ।’ তিনি বললেন, “অবশিষ্ট সম্পদ তাড়াতাড়ি খরচ করো। তুমি আমাকে এ-অবশিষ্ট সম্পদ থেকে রেহাই না দেওয়া পর্যন্ত আমি আমার পরিবারের



কারও কাছে যাব না।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাত আদায়ের পর আমাকে ডেকে বললেন, “তোমাকে দেওয়া মালের অবস্থা কী?” আমি বললাম, ‘সেগুলো আমার কাছেই আছে। আমার কাছে কেউ আসেনি।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে রাত কাটালেন। বর্ণনাকারী হাদীসের বাকি অংশ বর্ণনা করলেন—‘এমনকি পরবর্তী দিনের ইশার সালাত আদায় করে তিনি আমাকে ডাকলেন। তিনি বললেন, “তোমার কাছে অবশিষ্ট মালের অবস্থা কী?” আমি বললাম, ‘আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ আপনাকে তা থেকে চিন্তামুক্ত করেছেন।’ তিনি তাকবীর দিলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করলেন।”’ ৩২৮

## কোনো সাহাবী অনুপস্থিত থাকলে তার খোঁজ নিতেন

আনাস ইবনে মালিক রাযি. হতে বর্ণিত, “নবীজি ﷺ সাবিত ইবনে কায়েসকে রাযি. তাঁর মজলিসে অনুপস্থিত পেলেন। তখন এক সাহাবী বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল, আমি তার সম্পর্কে জানি।’ তিনি গিয়ে দেখতে পেলেন, সাবিত রাযি. তার ঘরে মাথা নুয়ে বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘সাবিত, কী অবস্থা তোমার?’ তিনি বললেন, ‘অত্যন্ত খারাপ। তার গলার স্বর নবীর ﷺ গলার স্বর থেকে উচ্চ হয়েছিল। কাজেই তার সব নেক আমল নষ্ট হয়ে গেছে। সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।’ ঐ ব্যক্তি ফিরে এসে নবীজিকে ﷺ জানালেন সাবিত রাযি. এ-সব কথা বলছে। তখন নবীজি ﷺ বললেন, “বরং সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত।”’ ৩২৯

কুররা ইবনে আইয়্যাস থেকে বর্ণিত, “এক ব্যক্তি তাঁর ছেলেকে নিয়ে নবীজির ﷺ কাছে এলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি তাকে ভালোবাসো?” সে বলল, ‘আমি তাকে যতখানি ভালোবাসি, আল্লাহ যেন আপনাকে ততখানি ভালোবাসেন।’ তারপর তার ছেলে একদিন মারা গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখতে না পেয়ে তার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। লোকটাকে বললেন, “তুমি কি আনন্দিত না যে, তুমি জান্নাতের যে-কোনো দরজা দিয়ে ঢুকতে চাইলে তোমার ছেলে এসে দৌড়ে তা খুলে দেবে?”’ ৩৩০

[৩২৮] আবু দাউদ (৩০৫৫)।

[৩২৯] বুখারী (৩৬১৩) ও মুসলিম (১১৯)।

[৩৩০] নাসাঈ (১৮৭০) ও আহমদ (১৯৮২৫)।

## সাহাবীদের বিপদে খোঁজ নিতেন

যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি. বলেন, “রাসূলুল্লাহ ﷺ উহদের যুদ্ধের দিন আমাকে সাদ ইবনে আর-রাবীর খোঁজে পাঠালেন। তিনি ﷺ আমাকে বললেন, “তুমি যদি সাদকে দেখতে পাও, তাহলে তাকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমার অবস্থা জানতে চেয়েছেন।” আমি তাকে মৃতদের মাঝে খুঁজতে লাগলাম, তখন তিনি তার জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ছিলেন। তার শরীরে বল্লম, তরবারি ও তিরের সত্তরটির বেশি আঘাত ছিল। আমি তাকে বললাম, ‘সাদ, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে সালাম জানিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, ‘কেমন আছ?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘রাসূলুল্লাহ এবং তোমার ওপর সালাম বর্ষিত হোক। তাঁকে বোলো, আমি বলেছি, ‘আল্লাহর রাসূল, আমি জান্নাতের সুবাস পাচ্ছি। আর আমার আনসার লোকদের বোলো, ‘তোমাদের কোনো অজুহাত খাটবে না, যদি রাসূল ﷺ ক্ষতিগ্রস্ত হন আর তোমরা চোখের পলক ফেলার সুযোগ পাও।’—এটা বলে তিনি ইন্তেকাল করলেন।” ৩৩১

সুলাইমান আল-বাজি রাহ. বলেন, “সাহাবীদের জন্য নবীজির ﷺ চিন্তার একটি দৃষ্টান্ত এই ঘটনা। কাউকে দেখতে না পেলেই তিনি ﷺ তার জন্য খোঁজখবর নিতেন।” ৩৩২

মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আস-সামী রাহ. বলেন, “যখন সাদ বললেন, ‘আমি জান্নাতের সুবাস পাচ্ছি’—এটি আক্ষরিক অর্থে হতে পারে, তিনি যে সুবাস পাচ্ছেন, সেটি এ-দুনিয়ার নয়, সত্যিই জান্নাতের। কিংবা তিনি নিশ্চিত ছিলেন (শাহাদাতের কারণে) শীঘ্রই তিনি জান্নাতে যাবেন আল্লাহর ইচ্ছায়, তাই এ-কথা রূপক অর্থে বলেছেন।” ৩৩৩

## সাহাবীদের মৃত্যুতে অনেক কষ্ট পেতেন এবং কাঁদতেন

আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, “মৃত্যুর যুদ্ধে নবীজি ﷺ সেনাপতি হিসেবে জায়িদ ইবনে হারিসাকে একদল সৈন্যসহ পাঠালেন এবং বললেন, “যায়েদ যদি

[৩৩১] বায়হাকী (২৬৯/৩) ও মালিক (৮৮৪)।

[৩৩২] মুত্তাফা শারহুল মুয়াত্তা (৬৮/৩)।

[৩৩৩] সুবুল হুদা ওয়ার রশাদ ফী সিরাতি খায়রিল ইবাদ (২৪৭/৪)।



শহীদ হয়, তা হলে জাফর সেনাপতি হবে; জাফর যদি শহীদ হয়, তা হলে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা সেনাপতি হবে।” আবদুল্লাহ বলেন, ‘ঐ যুদ্ধে তাদের সঙ্গে আমিও ছিলাম। (যুদ্ধ শেষে) আমরা জাফর ইবনে আবু তালিবকে রাখি। খুঁজতে গিয়ে তাকে শহীদদের মধ্যে পেলাম। তখন আমরা তার দেহে বর্শা ও তিরের নব্বইটিরও বেশি আঘাতের চিহ্ন দেখেছিলাম।” ৩৩৪

আনাস ইবনে মালিক রাখি। (উপরের একই ঘটনা সম্পর্কে) বলেন, “নবীজি ﷺ খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে বললেন, “তোমাদের ভাই ও শত্রুরা যুদ্ধে নেমেছে। যায়েদ পতাকা নিলো এবং সে শহীদ হলো। এরপর জাফর ইবনে আবু তালিব পতাকা নিল, সেও শহীদ হলো। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা পতাকা নিল, সেও শহীদ হলো। এরপর আল্লাহর অন্যতম তরবারি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ পতাকা নিল এবং জয়লাভ করল।” ৩৩৫

আয়িশা রাখি। থেকে বর্ণিত, “আমি রাসূলুল্লাহকে ﷺ উসমান ইবনে মাযউনের লাশে চুমু খেতে দেখেছি। আমি তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে দেখেছি।” ৩৩৬

মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ রাখি। থেকে বর্ণিত, “উসমান ইবনে মাযউন রাখি। মারা গেলে তার লাশ আনা হলো, তারপর লাশ দাফন করা হলো। নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে একটি পাথর নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিলেন। কিন্তু লোকটি তা বহন করতে অক্ষম হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে পাথরটির কাছে গেলেন এবং নিজের জামার আস্তিন গোটালেন।

মুত্তালিব বললেন, আমাকে যে-ব্যক্তি এ-ঘটনা অবহিত করেছেন, তিনি বলেন, ‘আমি যেন এখনো রাসূলুল্লাহর ﷺ বাহুদ্বয়ের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি, যখন তিনি তাঁর জামার আস্তিন গুটিয়েছিলেন। তারপর তিনি পাথরটি দু হাতে তুলে এনে (উসমান ইবনে মাযউনের) শিয়রে রাখেন। তিনি বললেন, “এর দ্বারা আমি আমার ভাইয়ের কবর চিনতে পারব এবং আমার পরিবারের কেউ মারা গেলে তার কাছে দাফন করব।”” ৩৩৭

উসমান ইবনে মাযউন রাখি। নবীজির ﷺ দুধভাই ছিলেন। তিনি প্রথমে ইথিওপিয়ায়

[৩৩৪] বুখারী (৪২৬১)।

[৩৩৫] বুখারী (১২৪৬)।

[৩৩৬] আবু দাউদ (৩১৬৩), তিরমিযী (৯৮৯) ও ইবনে মাজাহ (১৪৫৬)।

[৩৩৭] আবু দাউদ (৩২০৬)।



হিজরত করেন, পরে মদীনায়ে আসেন এবং বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি ইসলামের আগমনের পূর্বে থেকেই মদ খেতে নিষেধ করতেন। মদীনায়ে হিজরতের ঠিক ত্রিশ মাস পর শাবান মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন।

## আহাবীদের ঈতানত ও পরাক্ষণ্ড গুণত

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, “একদা আমরা (সাহাবাগণ) রাসূলুল্লাহকে   ঘিরে বসেছিলাম। আমাদের জামাআতে আবু বাকর এবং উমার রাযি. ও ছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ   আমাদের মাঝ থেকে উঠে গেলেন। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলে আমরা শঙ্কিত হলাম—তিনি কোথাও কোনো বিপদের সম্মুখীন হলেন কিনা। আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আমিই সর্বপ্রথম বিচলিত হলাম। তাই তাঁর খোঁজে বের হয়ে পড়লাম।

আমি বনু নাজ্জারের জনৈক আনসারীর বাগানের কাছে গেলাম। বাগানের ভেতর প্রবেশের কোনো পথ খুঁজে পাওয়া যায় কি না, সেজন্য চারদিকে ঘুরলাম। কিন্তু পেলাম না। হঠাৎ দেখতে পেলাম, বাইরের একটি কুয়া থেকে একটি নালা বাগানের অভ্যন্তরে প্রবাহিত হচ্ছে। সংকীর্ণ নালাকে জাদওয়াল বলা হয়। আমি নিজেকে শেয়ালের মতো সংকুচিত করে নর্দমার মধ্য দিয়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, “আবু হুরাইরা নাকি?” আমি বললাম, ‘হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ!’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “কী ব্যাপার?” আমি বললাম, ‘আপনি আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ উঠে চলে এলেন, আর দীর্ঘ সময় পরও ফিরে না আসায় আমরা বিচলিত হয়ে পড়লাম। আমাদের অনুপস্থিতিতে কোথাও বিপদের সম্মুখীন হলেন কি না, আমাদের এ-আশঙ্কা হলো। আমি সর্বপ্রথম বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। আমি এ-দেয়ালের কাছে এসে শেয়ালের ন্যায় সংকুচিত হয়ে নালার ভিতর দিয়ে এখানে উপস্থিত হলাম। অন্যরা আমার পেছনে আছে।’ তিনি তাঁর জুতা-জোড়া আমাকে দিয়ে বললেন, ‘আবু হুরাইরা, আমার জুতা-জোড়া সাথে নিয়ে যাও। এ-বাগানের বাইরে যার সাথেই তোমার সাক্ষাৎ হয়, তাকে বলো, “যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এ-সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।”

আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, “সর্বপ্রথম উমারের রাযি. সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাকে বললেন, ‘আবু হুরাইরা, জুতা-জোড়া কার?’ আমি বললাম,



“আল্লাহর রাসূলের। তিনি আমাকে এ-জুতা-জোড়াসহ এই বলে পাঠিয়েছেন যে, ‘যে ব্যক্তি প্রশান্ত মনে এ-সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই, তাকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দেবো।’ আমার এ-কথা শুনে উমার রাযি. আমার বুকের উপর এমন জোরে চপেটাঘাত করলেন যে, আমি পেছন দিকে পড়ে গেলাম।

তিনি বললেন, ‘আবু হুরাইরা, তুমি (রাসূলুল্লাহর কাছে) ফিরে চলো। তাই আমি রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে কাঁদো কাঁদো অবস্থায় ফিরে এলাম। আমার পেছনে পেছনে উমার রাযি. সেখানে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “আবু হুরাইরাহ, তোমার কী হয়েছে?” আমি বললাম, ‘আমার সাথে উমারের দেখা হলো। আপনি আমাকে যে-সুসংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তাকে সেটা জানালে তিনি আমার বুকে এমন জোরে ঘুষি মারলেন যে, আমি পিছন দিকে পড়ে গেলাম। তিনি এটাও বলেছেন যে, আমি যেন (আপনার কাছে) ফিরে যাই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “উমার, কেন তুমি এমন কাজ করলে?” তিনি বললেন, ‘রাসূলুল্লাহ, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হোক। আপনি কি আপনার জুতা-জোড়াসহ আবু হুরাইরাকে এ বলে পাঠিয়েছেন যে, যার সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয়, তাকে বলো, যে-ব্যক্তি অন্তর থেকে এ-সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ।” উমার রাযি. বললেন, ‘এরূপ করবেন না; আমার আশংকা হচ্ছে, এতে লোকেরা (আমল বর্জন করে) এর উপর ভরসা করে বসে থাকবে; কাজেই লোকদেরকে আমাল করার সুযোগ দিন।’ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “আচ্ছা, তা হলে বাদ দাও।” ৩৩৮

## বদর যুদ্ধে নবীজি সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন

ইবনে হিশাম রাহ. বলেন, “নবীজি ﷺ বদর পৌঁছে সেখানে তাঁর ফেললেন। হাবাব ইবনে মুনাযির রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এই স্থান, যেটি আপনি ঠিক করলেন, এটি কি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে, যেন আমরা এখান থেকে না সরি; নাকি এটি শুধুই একটি মতামত, যুদ্ধের একটি কৌশল?’ নবীজি ﷺ বললেন, “বরং, এটি একটি

মতামত, যুদ্ধের একটি কৌশল।” তিনি বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল, এটি ভালো অবস্থান হবে না। আমাদের শত্রুর নিকটস্থ জলাশয়ের কাছে থাকা উচিত। আমরা সেগুলোর পানি তুলে নিয়ে খালি করে আলাদা জলাধার বানাবো। এরপর যুদ্ধ শুরু হলে আমাদের পান করার পানি থাকবে, তাদের কিছুই থাকবে না।’ নবীজি ﷺ বলেন, “আপনি ঠিক বলেছেন।” তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং সঙ্গীদের নিয়ে শত্রুর নিকটস্থ জলাশয়ের কাছে তাঁর ফেললেন। তারপর কুয়াগুলো ফাঁকা করে দেয়ালের পাশে জলাধার তৈরি করে পানি দিয়ে ভর্তি করার নির্দেশ দিলেন।” ৩৩৯

উহুদ যুদ্ধেও সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, “নবীজি ﷺ বদরের যুদ্ধের গনিমতে পাওয়া তাঁর যুলফিকার নামের তরবারি নিলেন। শুরুতে তিনি মুশরিকদের সাথে মদীনায় থেকে যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি এমন কয়েকজন বললেন, ‘আমরা উহুদে গিয়ে যুদ্ধ করতে চাই, তা হলে বদরের মতো সাওয়াব আমরাও লাভ করতে পারব।’ তারা তাঁকে রাজি করানোর চেষ্টা করতে লাগলেন এবং সবশেষে তিনি (রাজি হয়ে) বর্ম গায়ে চড়ালেন। যখন তিনি বর্ম পরে ফেললেন, তখন তাদের কিছু সাহাবী এ-সিদ্ধান্ত নিয়ে আফসোস করতে লাগলেন। তারা বলতে লাগলেন, ‘আল্লাহর রাসূল, মদীনায় থাকুন। সিদ্ধান্ত আপনার একার ওপর।’ তখন তিনি বললেন, “একজন নবীর শানে এটি মানায় না যে, তাঁর দল ও শত্রুদের মাঝে আল্লাহ ফয়সালা করার আগেই তিনি বর্ম পরে খুলে ফেলবেন।” ৩৪০

ইফকের ঘটনায় আয়িশাকে রাযি. মুনাফিকরা মিথ্যা অপবাদ দিলে নবীজি ﷺ তাঁর সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেছিলেন। আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, “তারা আমার নামে অপবাদ দিলে নবীজি ﷺ খুতবা দিতে দাঁড়ালেন। আল্লাহর হামদ পাঠ করে বললেন, “যারা আমার স্ত্রীর নামে অপবাদ দিচ্ছে, তাদের ব্যাপারে আমার কী করা উচিত, আপনারা পরামর্শ দিন। আল্লাহর কসম, আমি তো আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভালো ব্যতীত অন্য কিছু জানি না। আর এমন ব্যক্তিকে জড়িয়ে তারা কথা তুলেছে, যার সম্পর্কে ভালো ব্যতীত অন্য কিছু জানি না, আর সে (সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল) তো আমার সঙ্গে

[৩৩৯] সীরাত আন-নববীয়াহ (১৬৭/৩)।

[৩৪০] হাকিম (২৫৮৮)।



ব্যতীত আমার ঘরে কখনো প্রবেশ করত না।”” ৩৪১

## সাহাবাদের জীবনযাপন নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতেন

সাহাবায়ে কেরামগণ ইসলামের ছায়াতলে আসার জন্য অনেক কষ্ট ও মুজাহাদা করেছেন। অনেকে তাদের বিলাসী জীবন ত্যাগ করে দারিদ্র্যের কষাঘাত সহ্য করেছেন। যেমন, মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি। তার মা, পরিবার এবং সব কিছু ছেড়ে রাসূলের ﷺ কাছে হিজরত করেছিলেন।

আলি ইবনে আবু তালিব থেকে বর্ণিত, “আমি এক শীতের দিনে রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘর হতে বের হলাম। (বের হবার) আগে আমি একটি লোমহীন চামড়া নিয়ে তা মাঝামাঝি কেটে গলায় ঢুকলাম এবং খেজুরের পাতা দিয়ে কোমরে শক্ত করে বাঁধলাম। আমি তখন খুব বেশী ক্ষুধার্ত ছিলাম। রাসূলুল্লাহর ﷺ ঘরে কোনো খাদ্যসামগ্রী থাকলে তা অবশ্যই খেয়ে ফেলতাম।

আমি খাবারের খোঁজে বের হয়ে গেলাম। তারপর জনৈক ইহুদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, সে তার বাগানে (কপিকল জাতীয়) চরকির সাহায্যে কুয়া হতে পানি তুলছিল। আমি প্রাচীরের একটি ছিদ্র দিয়ে তাকে দেখলাম। সে প্রশ্ন করল, ‘হে বেদুঈন, কী চাও? তুমি প্রতি বালতির বিনিময়ে একটি করে খেজুর পাবে, আমার বাগানের পানি তুলে দেবে?’ আমি বললাম, ‘হ্যাঁ, দরজা খোলো; আমি ভেতরে আসি।’ সে দরজা খুললে আমি ভেতরে গেলাম। তারপর সে একটি বালতি এনে দিল। আমি বালতি ভরে পানি উঠাতে লাগলাম আর সে প্রতি বালতিতে একটি করে খেজুর দিতে লাগল। অবশেষে খেজুরে আমার হাতের মুঠি ভরে গেল। আমি তখন বালতি রেখে দিয়ে বললাম, ‘আমার যথেষ্ট হয়েছে। আমি খেজুরগুলো খেয়ে পানি পান করলাম।’

মসজিদে এসে রাসূলুল্লাহকে ﷺ সেখানে পেলাম। আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। এমন সময় চামড়ার তালিযুক্ত একটি ছেড়া চাঁদর গায়ে জড়িয়ে মুসআব ইবনে উমাইর রাযি। এসে আমাদের সামনে হাজির হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার বর্তমান করুণ অবস্থা দেখে এবং তার পূর্বের সচ্ছল অবস্থার কথা মনে করে কেঁদে ফেললেন।

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘সে-সময় তোমাদের কী অবস্থা হবে, যখন তোমাদের কেউ সকালে এক জোড়া পোশাক পরবে আর বিকেলে পরবে অন্য জোড়া। আর সামনে খাদ্যভর্তি একটি পেয়ালা রাখা হবে, অন্যটি উঠিয়ে নেওয়া হবে। তোমরা তোমাদের ঘরগুলো এমনভাবে পর্দায় ঢেকে রাখবে, যেভাবে কাবা ঘরকে গিলাফে ঢেকে রাখা হয়।’ সাহাবীগণ আরয করেন, ‘আল্লাহর রাসূল, আমরা তো তখন বর্তমানের চেয়ে অনেক সচ্ছল থাকব। বিপদাপদ ও অভাব-অনটন হতে নিরাপদ থাকব। ফলে ইবাদাত বন্দেগির জন্য যথেষ্ট অবসর পাব।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “বরং বর্তমানটাই তোমাদের জন্য তখনকার তুলনায় অনেক ভালো।” ৩৪২

হাদীসের অর্থ হলো, বিষয়টি এমন যে, ধনী ব্যক্তি তার সম্পদ নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকবে এবং ইবাদাতে সময় কম পাবে। অপরদিকে যার শুধু ততটুকুই আছে, যা তার জন্য যথেষ্ট, তার সম্পদের পেছনে অতিরিক্ত সময় নষ্টের প্রয়োজন নেই। তাই সে নিজেকে ইবাদাতে বেশি সময় ব্যস্ত রাখতে পারে।

## কোনো কারণে সম্পদের অংশ দিতে না পারলেও জাহাবীদের খুশি রাখতে

আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, “একবার নবীজি ﷺ কুরাইশ ও আরব-গোত্রদের উপহার দিলেন, কিন্তু আনসারদের কিছুই দিলেন না। এতে তারা কষ্ট পেল এবং কথা বলতে শুরু করল এবং একপর্যায়ে একজন বলে বসল, ‘আল্লাহর নবী ﷺ তাঁর লোকদেরকেই শুধু দিচ্ছেন।’ তখন সাদ ইবনে উবাদা রাযি. নবীজির ﷺ কাছে এসে বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল, এই লোকগুলো (আনসারগণ) আপনার গনিমতের বিতরণের ব্যাপারে কষ্ট পেয়েছে। আপনি আরব-গোত্রগুলোকে সম্পদ দিয়েছেন এবং আনসারগণ কিছুই পায়নি।’ নবীজি ﷺ বলেন, “তুমি কী ভাবছ, সাদ?” তিনি বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল, আমি তো আমার লোকদেরই একজন। আমি কেউই না এখানে (মতামত দেওয়ার)।’ নবীজি ﷺ বললেন, “এখানে তোমার লোকদের জড়ো করো।” তখন সাদ তাদের নিয়ে আসলেন।

মুহাজিরদের থেকে কিছু লোক এলে নবীজি ﷺ তাদেরকেও ঢুকতে দিলেন।



অন্যরা আসতে চাইলে তাদের চলে যেতে বলা হলো। যখন সবাই জড়ো হলো, সাদ তাঁর কাছে এসে বললেন, ‘আনসাররা আপনার কাছে জড়ো হয়েছে।’ নবীজি ﷺ তাদের কাছে এসে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তারপর বললেন, “হে আনসার, তোমাদের ব্যাপারে এ আমি কী শুনছি যে, তোমরা কষ্ট পেয়েছ? যখন তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে, তখন আল্লাহ আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে হেদায়েত দেননি? তোমরা দরিদ্র ছিলে, আল্লাহ তোমাদের সম্পদশালী করলেন! তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে, আল্লাহ তোমাদের হৃদয়গুলো এক করে দিলেন।” তারা বললেন, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগ্রহ আমাদের ওপর সবচেয়ে বেশি।’ তিনি বললেন, “হে আনসার, তোমরা আমার কথার উত্তর দাও।” তারা বললেন, ‘আমরা আপনাকে কী জবাব দেব! সকল অনুগ্রহ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে এসেছে।’ তিনি ﷺ বললেন, “তোমরা ইচ্ছা করলেই সত্য কথাগুলো বলতে পার এবং আমি সেগুলো স্বীকার করি যে—আপনি অস্বীকৃত অবস্থায় আমাদের কাছে এসেছেন, আমরা আপনার ওপর বিশ্বাস এনেছি। আপনার কোনো সাহায্য ছিল না, আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি। আপনি বহিষ্কৃত অবস্থায় এসেছেন, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। আপনি দরিদ্র ছিলেন, আমরা আপনাকে ধনী করেছি।

হে আনসার, তোমরা কি দুনিয়াবি তুচ্ছ জিনিস, যা দিয়ে মানুষের অন্তরকে (ইসলামের দিকে) টানার চেষ্টা করি, সেগুলোর জন্য দুঃখ পাচ্ছ? যেখানে কিনা আমি তোমাদের ইসলাম দিয়েছি! হে আনসার, তোমরা কি খুশি নও যে, লোকেরা উট-ভেড়া নিয়ে ঘরে ফিরবে আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে ঘরে ফিরবে? যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম, হিজরতের কারণে, নাহলে আমি নিজেকে আনসার বলে দাবি করতাম। যদি লোকেরা এক পথে যেত আর আনসারগণ অন্য পথে যেত, তবে আমি আনসারদের পথেই যেতাম। ইয়া আল্লাহ, আনসারদের ওপর, তাদের সন্তানদের ওপর, তাদের নাতি-নাতনিদের ওপর রহমত বর্ষণ করো!”

লোকেরা তখন এত কাঁদতে লাগল যে, কান্নায় তাদের দাড়ি ভিজে গেল। তারা বলে উঠল, ‘আমরা আমাদের অংশে আল্লাহর রাসূলকে ﷺ পেয়ে আমরা খুশি।’ এরপর নবীজি ﷺ চলে গেলেন এবং আমরাও বেরিয়ে গেলাম।”<sup>৩৪৩</sup>

## প্রত্যেক জাহাবীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আচরণ করতেন

নবীজি ﷺ উমারের আত্মমর্যাদার দিকে খেয়াল রাখতেন। আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, “নবীজি ﷺ বললেন, “আমি নিদ্রিত ছিলাম। দেখলাম, আমি জান্নাতে আছি। হঠাৎ দেখলাম, এক নারী এক দালানের পাশে উষু করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, “এ-দালানটি কার?” তারা উত্তরে বললেন, ‘উমারের।’ তখন তাঁর আত্মমর্যাদার কথা আমার স্মরণ হলো। আমি পেছনের দিকে ফিরে চলে এলাম।” এ-কথা শুনে উমার রাযি. কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ, আপনার সামনে কি আমার কোনো মর্যাদাবোধ থাকতে পারে?’” ৩৪৪

নবীজি ﷺ তাঁর সাহাবীদের অনুভূতির কত যত্নবান ছিলেন, তা এ-হাদীস থেকে বোঝা যায়।

## উজ্জ্বলতার রাখি. লজ্জার ব্যাপারে খেয়াল রাখতেন

আয়িশা রাযি. বলেন, “রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে শুয়ে ছিলেন; তাঁর উরু কিংবা পায়ের কিছু অংশ উন্মুক্ত ছিল। আবু বাকর রাযি. এসে অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দিলেন এবং এ-অবস্থাতে কথাবার্তা বললেন। তারপর উমার রাযি. অনুমতি চাইলে অনুমতি দিলেন এবং এ-অবস্থাতেই কথাবার্তা বললেন। উসমান রাযি. অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে বসলেন এবং তাঁর কাপড় ঠিক করলেন।

উসমান রাযি. এসে কথা বলে চলে যাওয়ার পর আয়িশা রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, “আবু বাকর রাযি. এলেন, আপনি তাকে কোনো গুরুত্ব দিলেন না ও অশ্রদ্ধা করলেন না; উমার রাযি. এলেন, আপনি তাকেও কোনো গুরুত্ব দিলেন না ও অশ্রদ্ধা করলেন না; উসমান রাযি. ঢুকতেই আপনি উঠে বসলেন এবং জামা ঠিক করে নিলেন!” রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “আমি কি তাকে লজ্জা করব না, ফেরেশতারা পর্যন্ত যাকে দেখলে লজ্জা করে!”” ৩৪৫

[৩৪৪] বুখারী (৩২৪২) ও মুসলিম (২৩৯৫)।

[৩৪৫] মুসলিম (২৪০১)।



## সাহাবীদের ভালো পরিণতি ও জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন

আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, “(একবার) নবীজি ﷺ আবু বাকর, উমার ও উসমানকে রাযি. নিয়ে উহুদ পাহাড়ে চড়লেন। পাহাড়টি নড়ে উঠল। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, “উহুদ, থামো! তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দু’জন শহীদ রয়েছেন।”” ৩৪৬

তিনি ﷺ বলেছেন, “আবু বাকর জান্নাতী, উমার জান্নাতী, উসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুযায়র ইবনুল আওয়াম জান্নাতী, সাদ ইবনে মালিক জান্নাতী, আব্দুর রাহমান ইবনে আওফ জান্নাতী, সাঈদ ইবনে য়ায়েদ জান্নাতী রাযি.।” ৩৪৭

নবীজি ﷺ এ-ছাড়াও বলেছেন, “হাসান ও হুসাইন জান্নাতে যুবকদের নেতা হবে।” ৩৪৮

তিনি ﷺ বলেন, “আমি স্বপ্নে আমাকে দেখলাম যে, আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি। হঠাৎ আবু তালহার রাযি. স্ত্রী রুমায়সাকে দেখতে পেলাম। আমার সামনে একজনের পদচারণার শব্দ শুনতে পেলাম। এটা ছিল বিলাল রাযি.।” ৩৪৯

জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে এ-রকম আরও অনেক সাহাবী রয়েছে।

## উপগমহার

নবীজি মুহাম্মদ ﷺ তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় থেকে শুরু করে আরব-উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের অনুসারীদের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন তাঁর বিনয় ও উদারতার দ্বারা। এভাবেই তিনি সাফল্যের সাথে আল্লাহর বাণী সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখন মুসলিমদের দায়িত্ব হলো, তাঁর সুন্নাহ নিজেদের জীবনে ধারণ করে ইসলামের বাণীকে সমুন্নত রাখা ও ছড়িয়ে দেওয়া। নবীজিকে ﷺ ভালোবাসার দাবি

[৩৪৬] বুখারী (৩৬৭৫)।

[৩৪৭] আবু দাউদ (৪৬৪৯), তিরমিযী (৩৭৪৮) ও ইবনে মাজাহ (১৩৪)

[৩৪৮] তিরমিযী (৩৭৬৮)।

[৩৪৯] বুখারী (৩৬৭৯) ও মুসলিম (২৪৫৭)।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর সূন্নাহের অনুসরণের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে।

আমরা যদি আন্তরিকতার সাথে নবীজিকে ﷺ তাঁর সাহাবীদের মতো ভালোবাসি, তা হলে আল্লাহও আমাদের ভালোবাসবেন এবং আখিরাতে আমরা তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের মাঝে থাকতে পারব।



নবীজি! আমাদের নবীজি! আমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় নবীজি!  
কখনো কী ভেবেছি নবীজি ﷺ এর সংসার জীবন কেমন ছিলো?

স্ত্রীদের সাথে কেমন ছিলেন তিনি? তিনিও যে স্ত্রীদের সাথে  
মান-অভিমান করতেন আমরা কি তা জানি? আবার স্ত্রীরাও  
অভিমান করলে তিনি পৌরুষ দেখানোর চেষ্টা না করে তাদের রাগ  
ভাঙাতেন। আমাদের কি জানা আছে কেমন করে তিনি স্ত্রীদের  
নিয়ে বিনোদন করতেন? পারিবারিক কোন বিপর্যয় আসলে কী  
করে সেটার সমাধান করতেন?

নিজ ছেলে মেয়েদের সাথে কেমন ছিলেন তিনি? হযরত ফাতিমা  
থেকে শুরু করে অন্যান্য ছেলে মেয়েদের সাথে তাঁর সম্পর্ক কেমন  
ছিল? মেয়ে-জামাইদের সাথে কেমন সম্পর্ক ছিল? শ্বশুর হিসেবে  
কেমন ছিলেন তিনি?

নিজ নাতিনাতিদের সাথে কেমন ছিলেন তিনি? কেমন করে  
তাদের আদর-যত্ন করতেন? কীভাবে তাদের বিভিন্ন আবদার পূরন  
করতেন?

নবীজির ঘরে কোন মেহমান আসলে কীভাবে তাদের আপ্যায়ন  
করতেন? কেমন আচরণ করতেন তাদের সাথে?

এভাবে প্রিয় নবীজির পুরো সংসারজীবনের নানানদিক এই বই  
থেকে হাদীসের আলোকে জানা যাবে ইন শা আল্লাহ।



আল-ইসলাফ  
মাকতাবাতুল আসলাফ

দোকান নং: ১৮ (আভারহাউস),  
ইসলামি টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০  
01762391754, 01733498004



ISBN